দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ৬ আগস্ট - ২০১২।। ২১ শ্রাবণ - ১৪১৯

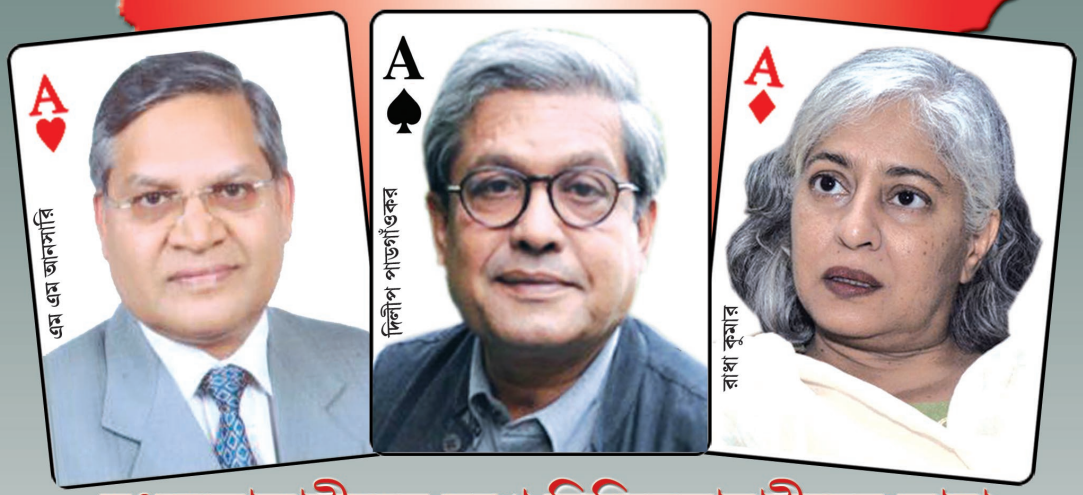

মধ্যস্থতাকারীদের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভাষা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

সিটুর ধর্মঘট প্রত্যাহারেই প্রমাণ বামেরা কাগুজে বাঘ ▯ ৯

সরকারে থেকেই ইউ পি এ-র বিরোধিতা করার কৌশল মমতার ▯ ১০

খোলা চিঠি : 'তুমি আমাকে ভোট দাও, আমি তোমাকে
মুক্তি কার্ড দেব' ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

রাজ্যের উন্নয়নে প্রয়োজন গ্রামবাসীর ক্রয় ক্ষমতা
বৃদ্ধি ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১২

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আলোচকদের 'সু-পরামর্শ' ভারতের
স্বার্থের কতটা অনুকূল? ▯ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় ▯ ১৪

কেন্দ্র সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীদের মুখে
কাদের ভাষা? ▯ বাসুদেব পাল ▯ ১৬

নবগ্রামের মন্দির ▯ ডঃ প্রণব রায় ▯ ২১

পৌরাণিক নগর : ইন্দ্রপ্রস্থ ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ২২

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অগ্রপথিক
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

প্রথম শহীদ কে? ▯ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ▯ ২৭

বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা ▯ ডঃ বি কে মুখোপাধ্যায় ▯ ২৮

আলোকোজ্জ্বল গুজরাট ▯ তারক সাহা ▯ ৩১

সর্বনিম্ন দরপত্র দাখিলকারীই খুনের বরাত পাবে ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩২

'হিগস-বোসন কণা' বা 'ঈশ্বর কণা' ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

ভাবনা-চিন্তা : ১৯-২০ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ ▯ উত্তর-পূর্বাঞ্চল :
৩০ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৪ ▯ ▯ সু-স্বাস্থ্য : ৩৫ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮
▯ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মধ্যস্থতাকারীদের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভাষা
পৃঃ ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ২১ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ৬ আগষ্ট - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা-র বিশেষ বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

স্বস্তিকা একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদ সাপ্তাহিক। আগামী ৯ আগষ্ট, ২০১২, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫ বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে স্বস্তিকা-র বিশেষ নতুন বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময়কাল ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সকল পাঠক-বন্ধুদের প্রতি বিনম্র নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই পত্রিকার গ্রাহক হোন ও অন্যদের গ্রাহক হতে অনুপ্রাণিত করুন। স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা মাত্র। অভিযান চলাকালীন এবং সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর, ২০১২-র মধ্যে গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকমূল্য স্বস্তিকা দপ্তরে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করুন। এর ফলে এবছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পেতে সুবিধা হবে। চেক বা ড্রাফট্ **Swastika** -এই নামে লিখে স্বস্তিকার ঠিকানায় পাঠাবেন। এছাড়া স্বস্তিকা-র নামে মনিঅর্ডার যোগেও টাকা পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পত্রিকা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী বিশেষ সংখ্যা

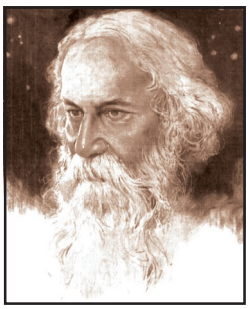

জন্মাষ্টমী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, স্বস্তিকারও। এই উপলক্ষে থাকছে বিশেষ নিবন্ধ 'কৃষ্ণচরিত্র'। লিখছেন **প্রীতিমাধব রায়**। অন্যদিকে ৬৪ পেরিয়ে ৬৫-তে পৌঁছেও স্বস্তিকা আজও অপ্রতিহত। এনিয়ে লিখছেন **রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক**। বাঙালির চিরন্তন শোকের দিন অর্থাৎ বাইশে শ্রাবণ রবিঠাকুরের মৃত্যুদিনটিকেও আমরা ভুলছি না। 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নিয়ে লিখেছেন **সুতপা চক্রবর্তী**।

থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও।

দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

সম্পাদকীয়

সর্বনাশা তোষণ নীতি

অসমের হিংসাত্মক জাতিদাঙ্গার মূল কত গভীরে এবং ব্যাপকতা কতখানি ইহার একটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে যখন দেখি ১১টি জেলার ৫০০ গ্রামে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেড় লক্ষাধিক লোক নিজেদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইতে বাধ্য হইয়াছে। দুই লক্ষেরও বেশি মানুষকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। শতখানেক মানুষ হিসার বলি হইয়াছেন। এই দাঙ্গার সূত্রপাত জুলাই মাসের প্রথমদিকে রাজ্যের বড়োল্যান্ড উপজাতি এলাকায় মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দুই ছাত্র নেতা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায়। তখন বিষয়টি স্থানীয় সমস্যাই ছিল। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি আয়ত্তে থাকিত। প্রশাসনের এই ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চারজন বড়ো মানুষ নিহত হয়। কোকরাঝাড় থেকে শুরু হওয়া এই জাতিদাঙ্গা যে দ্রুততার সহিত ধুবড়ি, চিরাঙ্গ, শোণিতপুর, বঙ্গাইগাঁও, উদালগুড়ি সহ প্রায় এক ডজন জেলায় ছড়াইয়া পড়ে, দাঙ্গা দমনে সেইরূপ তৎপরতা পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের পক্ষে লক্ষ্য করা যায় নাই। পরিস্থিতি যখন চরম আকার ধারণ করিয়াছে, তখন সরকার বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়ার জেলাগুলিতে কার্ফু জারি করিয়াছে, শান্তি রক্ষার চরম ব্যবস্থা হিসাবে দেখামাত্র গুলি'র নির্দেশ দিয়াছে। সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করিয়াছে। দাঙ্গার ব্যাপকতা ও তরুণ গগৈ সরকারের উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া কেন্দ্র সরকারও সক্রিয় হইয়াছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা ঘুরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা হইল, যে কারণে এই জাতিদাঙ্গা ঘটিল, তাহা দেখিয়াও দেখা হইতেছে না কেন?

বস্তুত অসমে হিংসাত্মক আন্দোলনের যাহা মূল কারণ, এই দাঙ্গার পিছনেও রহিয়াছে সেই একই কারণ। প্রশাসন ও সরকারি স্তরে ইহা স্বীকার না করা হইতে পারে, কিন্তু অসমে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা যে এক প্রধান সমস্যা, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যায় দিল্লীসহ দেশের কয়েকটি রাজ্য জর্জরিত, কিন্তু অসম এই সমস্যায় সর্বাধিক আক্রান্ত। বাংলাদেশ হইতে ধারাবাহিক মুসলিম অনুপ্রবেশ অসমে জনবিন্যাসের কাঠামোকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। বিশেষত নিম্ন অসমের বড়ো-অধুষিত জেলাগুলিতে বড়ো জনজাতিদের কার্যত সংখ্যালঘু করিয়া তুলিয়াছে। অসমের জমিজমা, ভিটেমাটি, এমনকী সত্রগুলির (বৈষ্ণবদের উপাসনাস্থল) এলাকাও গ্রাস করিয়া লইতেছে অনুপ্রবেশকারীরা। কর্মসংস্থানের পরিসরও সঙ্কুচিত হইতেছে। এই অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই। দাঙ্গা সেই ঘৃণার বিস্ফোরণ। ইতিপূর্বে আদালতও বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে অসম সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করিয়া বহিষ্কারের আদেশও দিয়াছে।

ইতিমধ্যে, বিদেশী চিহ্নিতকরণ ও বহিষ্কারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সংখ্যালঘু তোষণের সংকীর্ণ রাজনৈতিক তাগিদে সরকারের সদিচ্ছা আর কার্যকর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতি কার্ড শুধু অসমেই নয়, গত কয়েক দশক ধরিয়া কংগ্রেস সারাদেশেই খেলিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী অসমে এখন সব থেকে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অজানা নয়। রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশঙ্কায় কংগ্রেস এই সর্বনাশা তোষণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। বর্তমান দাঙ্গা এবং ভবিষ্যতে আরও দাঙ্গা হইবার যে সম্ভাবনা রহিয়া যাইতেছে তাহা এই সর্বনাশা তোষণ নীতির ফল।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যুগ-প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে এবং যদিও আদিযুগের প্রথম-প্রয়াসের মধ্যে কাঁচা-হাতের অপরিণত স্বাক্ষর ছিল—যেমন থাকে সুদক্ষ স্থপতির প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে, তথাপি নির্ভীক উদ্যম ও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়া সে এক বিস্ময়কর ফল প্রসব করিয়াছিল।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বাঁ দিক থেকে রাজেশ আগরওয়াল, যোগেশ শাস্ত্রী, লক্ষ্মনারায়ণ তোদী, বালব্যাস শ্রীকান্ত শর্মা, সুকন্যা দে, ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া, বীরমাতা সুমিত্রাদেবী কোঠারী, অশোক পারেখ, যুগলকিশোর জৈথেলিয়া, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশবরাও দীক্ষিত।

অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা বাংলাদেশী সেনা হিসেবে কাজ করছে : তোগাড়িয়া

বাসুদেব পাল ॥ ''শ্রীরামমন্দির অযোধ্যার ওই স্থানেই হবে, অন্য কোথাও নয়। যাঁরা মনে করেন সর্বসম্মতিক্রমে অথবা মুসলমানদের অনুমোদনক্রমে মন্দির হবে, তাঁরা ভুল করছেন। ১৫২৮ থেকে আজ পর্যন্ত বিগত সাড়ে চারশ বছরে সাড়ে চার লক্ষ হিন্দু শ্রীরামমন্দিরের জন্য আত্মবলিদান করেছেন। বীরমাতা সুমিত্রা দেবীর মতো অনেকেই পুত্রসন্তান, ভাই-দাদা, স্বামীকে হারিয়েছেন। রাম-শরদের শহীদ হওয়া অপূর্ণ কাজ তখনই পূর্ণ হবে যখন ওই স্থানে মন্দির নির্মাণ হবে।'' এই বক্তব্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়ার। তিনি গত ২৯ জুলাই কলকাতায় 'মহাজাতি সদন'-এর মূল প্রেক্ষাগৃহে রাম-শরদ কোঠারি স্মৃতি সঙ্ঘ আয়োজিত 'রাম-শরদ কোঠারি প্রতিভা সম্মান ২০১২' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন।

হলভর্তি শ্রোতৃবৃন্দের সামনে ডাঃ তোগাড়িয়া আরও বলেন, মন্দির ধ্বংস হয়েছিল একটি অশুভ-অসভ্য চিন্তাধারার কারণে। একই কারণে হাজার হাজার মন্দির নষ্ট করা হয়েছে। রামমন্দিরের সঙ্গে বাবর বা তার পূর্বপুরুষদের কোনওরকম শত্রুতা ছিল না। একই চিন্তাধারার কারণে দেশভাগ হয়েছে। এই চিন্তাধারার কারণে আমরা চারদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছি। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্বকল্যাণকারী হিন্দুসমাজকে চিরতরে বিনষ্ট করা। ইসলাম, খৃস্টান, সাম্যবাদী ও সেকুলার বিচারধারাও হিন্দুত্ব বিরোধী। এরা কেউই জেহাদি ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে বিরোধিতা করে না। ডাঃ তোগাড়িয়ার মতে, শ্রীরামমন্দির নির্মাণের দুটি পথ। এক— দেশের সংসদ আইন পাস করুক মন্দিরের জন্য, অথবা দেশের ৬ লক্ষ গ্রাম-শহর থেকে হিন্দু সমাজ একত্রিত হয়ে এগিয়ে এসে সবরকম বাধা তুচ্ছ করে, বলিদান দিয়ে মন্দির তৈরি করুক। বীরমাতা সুমিত্রা দেবী কোঠারির মতো অনেকেই এই জীবনে মন্দির দেখে যেতে চান। মন্দির যহী বনায়েঙ্গে, মন্দির বনকর রহেঙ্গে— মন্দির ওখানেই তৈরি হবে এবং মন্দির রূপেই থাকবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিকভাবে সুযোগ এসেছিল। হাতছাড়া হয়েছে (We have lost initiative)। এখন তো প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ওই স্থানে মন্দিরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যারা ৪৫০ বছরে বোঝেনি, তারা এখনও বুঝবে না। মুসলমান ভোট ছাড়াও ক্ষমতা দখল করা যায়। বিজেপি হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসেছে। গান্ধীজী সারাজীবন মুসলমানদের জন্য অনেককিছু করেছেন, জীবন দিয়েছেন। পাকিস্তানে তাঁর নামে একটা রাস্তাও নেই। ভারতে রাজনীতিতে ইসলামীকরণের জন্য তিনি রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে দায়ী করে বলেন, উত্তরপ্রদেশে কখনও ৪৪-এর বেশি মুসলমান এম এল এ

ছিল না। এবার ৬৬ জন বিধায়ক, দশজন মন্ত্রী। হিন্দু শরণার্থীদের অবহেলা এবং বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের তোষণের জন্য বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

কোকরাঝাড়ের দাঙ্গা বিষয়ে তিনি একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান— ওখানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা বাংলাদেশী সেনা হিসেবে কাজ করেছে। হিন্দুদের জমি-জায়গা দখল এবং অত্যাচার হয়েছে। সরকার যদি মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালাতে পারে তাহলে বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে কেন নয়— বলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন। এদিন তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে 'রাম-শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান-এ সম্মানিত করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ তোদী, আচার্য যোগেশ শাস্ত্রী এবং সুকন্যা দে। এঁরা সবাই এককভাবে গোরক্ষা, যুব সংগঠন, মানবসেবা এবং ধর্মজাগরণের কাজ করে চলেছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রাজেশ আগরওয়াল। সভা পরিচালনা করেন সমাজসেবী শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। পৌরোহিত্য করেন আশোক পারেখ এবং ধন্যবাদ দেন সঞ্জীব জাজোদিয়া। শুরুতে মঞ্চস্থ সকলে রাম-শরদ এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আর এস এস-এর পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া এবং কেশবরাও দীক্ষিত। যুগলজীর ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে আগামী ২ অক্টোবর। এদিন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তাঁকে শাল জড়িয়ে আগাম অভিনন্দন জানান ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। মহাজাতি সদন ছিল এদিন কানায় কানায় পূর্ণ।

নেপালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

সংবাদদাতা॥ নেপালে সরকারি স্বীকৃতি পেল 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'। এতদিন পর্যন্ত নেপালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ চলত 'জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান নেপাল'-নামে। সম্প্রতি নেপালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সরকারিভাবে পঞ্জীকৃত হতে চলেছে। জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের নামে অনেক একল বিদ্যালয় চলছিল। নেপালে ৩৪টি জেলায় ১০০০টি গ্রাম সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও সংস্কারের কাজ চলছে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ও সময়ের দাবির দিকে নজর রেখেই নেপালের আইনমাফিক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর পঞ্জীকরণের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এবার থেকে কাজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামেই চলবে।

গত ৮, ৯ ও ১০ মে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে তিন দিন ব্যাপী এক বড় অনুষ্ঠানে সভাপতির নাম ঘোষণা করেছেন পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশচন্দ্রজী। সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন কাঠমাণ্ডুর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ শশীকুমার লাল। সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন কো-অপারেটিভ সেক্টরের অভিজ্ঞতালব্ধ সুভাষ অধিকারী, দ্বিতীয় সহ-সভাপতি হয়েছেন বরিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার বিন্দেশ্বরাচন্দ্র, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ রেগমি এবং সম্পাদক রামনারায়ণ ঠাকুর। অন্য একজন সম্পাদক হয়েছেন মুরলী নিরৌলা এবং কোষাধ্যক্ষ সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণ একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবী। অন্য দুজন সদস্য হলেন নেপালী সিনেমার সফল অভিনেতা টীকাবাহাদুর পাহাড়ী এবং বীরেন্দ্র বুঢ়াথ। তিনদিনের সম্মেলনে নেপালের ২৬টি জেলা থেকে কার্যকর্তারা যোগ দিয়েছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে আয়োজিত সন্ত সম্মেলনে নেপালের ৩০টি জেলা থেকে পূজ্য সন্তবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা সকলে দেশ, ধর্ম, সমাজ এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। সকলেই পরিষদের কাজে সর্ববিধ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস

মুসলমানদের তুষ্ট করতে বাদ বঙ্কিমচন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বঙ্কিমচন্দ্রের ১৭৫তম জন্মবর্ষে আগামী উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রম থেকে তাঁকেই বাতিল করে দিল সংস্কৃতির ধ্বজাধারী তৃণমূল সরকার। সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার যদিও বলেছেন, আধুনিক ও সময়োপযোগী করে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমকে সাজানো হয়েছে। কেবল আধুনিকতার জেরেই কি তবে পাঠ্যসূচি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দেওয়া হয়েছে না অন্য কিছু রহস্য রয়েছে?

শোনা যাচ্ছে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং মুসলমানদের তুষ্ট করতেই উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে অন্যান্য পাঠক্রম থেকেও বঙ্কিমকে ব্রাত্য করে

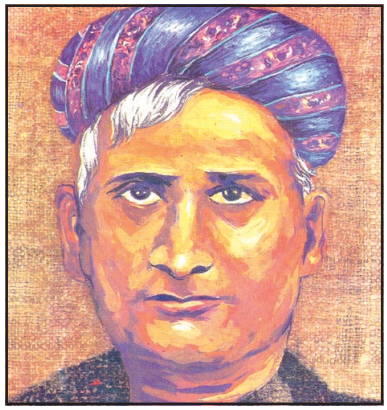

দেওয়া হবে আগামীদিনে। যদি মুখে বলা হচ্ছে অন্য কথা। অভীকবাবু প্রশ্ন তুলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে কি কোনওভাবে পাঠ্যসূচিতে রাখা সম্ভব? তাঁর উপন্যাস গল্পতে পরিণত করা সম্ভব নয়। চলিত ভাষাতে রূপান্তরিত করাও অমার্জনীয় অপরাধ। আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমে না থাকলেও তাঁর লেখা 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থ তালিকাভুক্ত রয়েছে।'

উল্লেখ্য, বিগত বাম সরকারও বঙ্কিমচন্দ্রকে চরম অপমান করেছিল তাঁর রচনা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে আর বর্তমান সরকার মুসলমানদের তুষ্ট করতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্রাত্য করে দিল। মুখে অবশ্য বলা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমে আধুনিক সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে কি বাংলা সাহিত্যের পাঠ সম্পূর্ণ হবে?

'আফস্পা'র ভাগ্য ক্যাবিনেট কমিটির হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির উপরই বর্তাল আফস্পা (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট)-র ভাগ্য। জম্মু- কাশ্মীরের জন্য প্রযোজ্য এই আইনটি নিয়ে দীর্ঘদিনই সেনা এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাত চলছে। গত ২৮ জুলাই রাজধানী শ্রীনগরে 'ইউনিফায়েড হেডকোয়ার্টার্স' বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা জম্মু-কাশ্মীর থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের তীব্র দাবি তুলেছেন। বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি, সেনাপ্রধান জেনারেল বিক্রম সিং, প্রতিরক্ষা সচিব শশীকান্ত শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

অমর আবদুল্লা

মনমোহন সিং

এ কে অ্যান্টনি

রাজ্য সরকারি সূত্রে ওই বৈঠকের পরদিন জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির 'অভূতপূর্ব উন্নতি'র জন্য জম্মু-কাশ্মীরের চারটি জেলা— শ্রীনগর, বুদগাম, জম্মু এবং সাম্বায় আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সরকার। সরকারি পক্ষ থেকে আরও যেটা জানানো হচ্ছে যে, ওই চারটি জেলা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ এবং আফস্পা প্রত্যাহার হলে রাজ্যের মানুষের কাছে সদর্থক বার্তা পৌঁছবে ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে তার মোকাবিলা করাও সম্ভব হবে। জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা যদিও অন্য কথাই বলছে। এ কে অ্যান্টনি পরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি দিল্লী ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।

এই আইনটি প্রত্যাহারের জন্য ওমর আবদুল্লা যেভাবে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন গত এক বছর ধরে তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি সবদিক খতিয়ে দেখে এনিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আফস্পা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পাক-জঙ্গিদের রমরমা যে বাড়বে তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

এদিকে কেন্দ্র ক্রমশ আপোসের নীতি নেওয়ায় কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এমনিতেই উদ্দীপিত।

সিটুর ধর্মঘট প্রত্যাহারেই প্রমাণ বামেরা কাগুজে বাঘ

শেষপর্যন্ত মমতার কড়া হুঁশিয়ারিতে ভয় পেয়ে সি পি এম নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠন সিটু পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। এতকাল কমিউনিস্টরা এই রাজ্যে বন্‌ধের কর্মনাশা রাজনীতি অবাধে চালিয়ে এসেছে জন সমর্থনে নয়। রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্র মহাকরণে বসে রাজ্যপাট চালাতো বামপন্থীরা। সরকারি সমর্থন ও প্রশ্রয়েই কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপর জোর করে, ভয় দেখিয়ে ধর্মঘট চাপিয়ে দিয়েছে। এই কমিউনিস্টরাই 'বাংলা বন্‌ধ' এই শব্দ বিন্যাসটি বাংলার ঘরে ঘরে চালু করেছে। সি পি এম এতকাল বাংলা বন্‌ধ সফলভাবে করেছে দলের সাংগঠনিক শক্তি এবং জনসমর্থনের শক্তিতে নয়। সরকারি প্রশাসন এবং পুলিশের প্রকাশ্য মদতেই রাজ্যবাসীর উপর বন্‌ধ চাপিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরেই এমনটা চলেছে। মিথ্যা প্রচারে অতি দক্ষ বাঙালি কমিউনিস্টরা বোঝাতো যে 'বাংলার মাটি তাদের দুর্জয় ঘাঁটি'। বামেদের ডাকা ধর্মঘটের দিন পশ্চিমবঙ্গে নাকি গাছের পাতাও নড়ে না। বামেদের ডাক মানে বাঘের গর্জন। এখন দেখা যাচ্ছে বামেরা আসলে কাগজের বাঘ। গ্রামে গঞ্জের মেলায় শিশুদের জন্য এমনই রংচং করা কাগুজে খেলনা বাঘ পাওয়া যায়। সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন সিটু এতকাল মহাকরণে তার খুঁটির জোরেই রাজ্যবাসীর উপর ক্ষমতার ছড়ি ঘুরিয়েছে। এখন আর আলিমুদ্দিনের নখদন্তহীন বৃদ্ধ অশক্ত বাঘেদের উপর সিটুর কর্মী সমর্থকরা তেমন ভরসা রাখতে পারছে না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সিটু বাংলা বন্‌ধ ডেকেছিল। সি পি এম সহ রাজ্যের সমস্ত বামপন্থী দলই সেই বন্‌ধ সমর্থন করেছিল। তবু বন্‌ধ সফল হয়নি। কারণ, সিটু নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনগুলির সদস্য সমর্থকরাই সকলে বন্‌ধে সামিল হয়নি। রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তর মহাকরণেই সিটু নিয়ন্ত্রিত সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন, 'কো-অডিনেশন কমিটি'-র ৯৫ শতাংশ সদস্য দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে বন্‌ধের দিন হাজিরা দিয়েছিলেন। স্রেফ ভয়ে। রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছিল যে উপযুক্ত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে চাকরির ক্ষেত্রে ছেদ পড়বে। অর্থাৎ, অবসরের পর প্রাপ্য পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি কমবে। ভবিষ্যতে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে— এই ভয়েই এতকাল বাম সমর্থক সরকারি কর্মীরা মুক্তকচ্ছ হয়ে বন্‌ধের

গূঢ়পুরুষের কলম

আগেই মহাকরণে আস্তানা গাড়তে ছুটে এসেছিল। ক্ষমতাহারা বিপ্লবীরা ভিজে বিড়ালের মতোই চুপ্‌সে গিয়েছিল। আলিমুদ্দিনের নেতারা অবশ্য অভয় দিয়েছিলেন চাকরিতে একদিনের জন্যেও যদি ছেদ পড়ে তবে সি পি এম হাইকোর্টে মামলা করবে। কিন্তু সত্যিই যখন বন্‌ধের দিন অনুপস্থিত সরকারি কর্মীদের চাকরিতে ছেদ পড়লো, তখন মামলার হুমকি দেওয়া নেতারা তর্জন-গর্জন ছাড়া আর কিছুই করলেন না। ক্ষতি যা হবার তা হল বিপ্লবী সরকারি কর্মীদের। বিপদের দিনে দলের নেতারা কেউই তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার সিটুর নিচুতলার কর্মী সমর্থকরা সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যেতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন, সিটুর বৃদ্ধ রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী মুখে যত বড় বড় বুলি আওড়ান না কেন, রাজ্য সরকার ধর্মঘটি বাস চালকদের লাইসেন্স বাতিল করলে শ্যামলবাবুর টিকিটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের এটাই এখন বড় সঙ্কট। বামপন্থী দল এবং তার শাখা সংগঠনের নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। নেতাদের উপর নিচুতলার দলীয় কর্মীদের আস্থা নেই। থাকার কথাও নয়। টানা ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে যে সব রয়্যাল বেঙ্গল টাইগাররা হাঁকডাকে আসর জমিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের কাউকেই গণমঞ্চে দেখা যাচ্ছে না। সকলেই আত্মগোপন করেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুলেট প্রুফ গাড়ি চড়ে তাঁর পাম এভিনিউয়ের বাড়ি থেকে আলিমুদ্দিনে সি পি এমের রাজ্য দফতরে আসেন। দোতলায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কামরায় দ্রুত ঢুকে দরজা বন্ধ করে কোন রাজকার্য করেন কেউ জানে না। তবে তিনি কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না সেকথা আলিমুদ্দিনের সমস্ত কর্মীরাই জানেন। একবার ভেবে দেখুন তো, সাম্প্রতিককালে সি পি এমের রেজ্জাক মোল্লা এবং সূর্যকান্ত মিশ্র ছাড়া তৃতীয় কোনও নেতাকে গণমঞ্চে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত হতে দেখেছেন বা শুনেছেন কীনা। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে সাধারণ মানুষের উপর অপরাধ প্রতিদিনই হচ্ছে। মা মাটি মানুষের প্রবক্তাদের দুঃশাসনে মায়েরা ধর্ষিতা হচ্ছেন। পরিবর্তনের সরকারের পুলিশ 'উপরি' না পেলে নড়ে না। তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা টিভি ক্যামেরার সামনে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন। শুধু কাজের কাজটি হয় না।

বাম আমলে যে সব কথাবার্তা মন্ত্রীরা যেভাবে বলতেন, ঠিক সেইভাবেই তৃণমূল মন্ত্রীরা এখন কথা বলছেন। মন্ত্রীদের 'হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা।

গত বছর বিধানসভার নির্বাচনের সময় রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বা মমতার প্রতি জনসমর্থনের যে জোয়ার ছিল তা কমপক্ষে ৩০ শতাংশ এখন কমেছে। বিশেষত, শহরাঞ্চলে তৃণমূল যেভাবে জনসমর্থন হারাচ্ছে, তা অকল্পনীয়। কিন্তু তৃণমূলের হারানো জন সমর্থনের ১ শতাংশও সি পি এম বা বামেরা পায়নি। হ্যাঁ, এই কথাটাই সম্প্রতি সি পি এমের মুখপাত্র সূর্যকান্ত মিশ্র অকপটে স্বীকার করেছেন।

সরকারে থেকেই ইউ পি এ-র বিরোধিতা করার কৌশল মমতার

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

গত ২১ জুলাই মমতা বস্তুত রণদামামা বাজিয়েছেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দিল্লী চলো'। এর অর্থ হলো— দিল্লীর শাসন ক্ষমতা অধিকার করা। মমতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তিনি সর্বভারতীয় নেত্রী। তাঁর ২১-জুলাইয়ের জনসভায় উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় থেকে বক্তারা উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়ের নেতা হরকাবাহাদুর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'যতদিন মমতার সরকার থাকবে ততদিন পাহাড়ে শান্তি থাকবে।' এবারের ২১-এর সভায় 'শহীদের' কথা কম ছিল। তৃণমূল নেত্রীর পরিকল্পনা হলো— তিনি ইউ পি এ ছাড়বেন না, কিন্তু প্রতিটি বিষয়েরই বিরোধিতা করবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তা হলো জুলিয়াস সিজার-এর নীতি 'কিক অ্যান্ড কিস'। এই নীতির অর্থ হলো— কভি কাঁধে হাত কভি অর্ধচাঁদ।

তৃণমূলের ঘোষিত নীতি হলো— ইউ পি এ-তে থাকবো, কিন্তু রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য রাখবো না। অর্থাৎ কেন্দ্রে দোস্তি, রাজ্যে কুস্তি। ঠিক সিপিএমের আগেকার নীতি। আদতে এ-রাজ্যের কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি তো বলেছেন, 'কংগ্রেসের কোনও কর্মী নেই, কিছু নেতা আছে।' কংগ্রেস কর্মীদের পদলোভ-ক্ষমতালোভ-অর্থলোভ দেখিয়ে রাজ্য কংগ্রেসকে কর্মীবিহীন করার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। এ কাজে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। নেত্রীর পরের স্থানটি অধিকারের জন্য সুব্রত মুখার্জী এক বেপরোয়া প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। নানাভাবে সিপিএম-কে নানা কথায় বিঁধছেন।

অথচ এই সুব্রত মুখার্জীই একদা সিপিএম-পন্থী দৈনিকে লিখেছিলেন— 'জ্যোতি বসু আমার রাজনৈতিক পিতা।' সুব্রত মুখার্জী এক নির্বাচনের সময়ে জনৈক পুলিশ অফিসারকে চড় মারেন, সেই মামলা জ্যোতি বসু প্রত্যাহার করে নিতে বলেন।

সুব্রতবাবুই মমতাকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। পরে আবার সুব্রত-মমতা সম্পর্ক এতই তিক্ত হয়েছিল যে মমতা সুব্রতবাবু-কে 'তরমুজ' বলেছিলেন। অন্যদিকে সুব্রতবাবু বলেছিলেন— 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'। তবে রাজনীতিতে কোনও কথাই শেষ কথা নয়। এখন আবার চিত্র বদলে গেছে।

কিন্তু একটা কথা, সব তৃণমূল নেতা-নেত্রী জানেন যে তৃণমূল সুপ্রিমো মুকুল রায়-কেই পছন্দ করেন। মুকুল রায়ের অবস্থান অটুট। কেন্দ্রের প্রতিটি নীতির বিরোধিতা করার জন্য নেত্রী ছ'জনের একটি কমিটি করেছেন। তাতে প্রাক্তন আমলা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। কমিটির প্রধান রাজ্যসভার সদস্য ডেরেকও ব্রায়ান। ইনিই নাকি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বিকল্প প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলেন।

তৃণমূলের সংগঠনের একটি ব্যবস্থা আছে। তা হলো তৃণমূলের পদাধিকারী, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদের সভা ডেকে নেত্রী দলের নীতি জানিয়ে দেন। নেত্রীর অপছন্দ হলে তাঁকে নেপথ্যে চলে যেতে হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন, সিন্ডিকেট প্রভৃতি ক্ষেত্রে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট। এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত চলছে।

এতো গেল তৃণমূলের সাংগঠনিক দিক। সরকারি তরফে দেখা যাচ্ছে অর্থের অভাবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হচ্ছে। ৩৪১টি ব্লক এবং ১২৬টি পুরসভার পাইপ লাইনে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জল সরবরাহ বন্ধ হতে পারে। আর্থিক সংকটই নাকি এর কারণ। অন্যদিকে আবার কলকাতা পুরসভার ট্রাইডেন্ট-ল্যাম্প নিয়ে 'কেলেঙ্কারি' প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে কলকাতা পুরসভার খানাপিনার খরচের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তি উন্নয়নের জন্য অর্থাভাব। বস্তির দায়িত্বে থাকা মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ যিনি অতুল্য ঘোষের পৌত্র, বস্তির অবস্থার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

এদিকে রাজ্য-সরকার কর না কমানোর জন্য পেট্রল ও ডিজেল-এর দাম বেড়েছে। তারজন্য ইতিমধ্যে বাসের সংখ্যা কমে গেছে। অটোরিক্সার ভাড়া বাড়ছে। এই পটভূমিতে ৩১ তারিখে বাস ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল মূলত বাস মালিকদের উদ্যোগে। তবে শেষপর্যন্ত সিপিএম বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন— বাসের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে। পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র সরকারি পরিবহনের শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সিপিএম তথা সিটু একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা পেট্রল-ডিজেলের উপর রাজ্যের কর কমানোর দাবিতে ব্যাপক প্রচার করতে পারতেন। কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে সিপিএমের অনীহা কেন? এটাও স্পষ্ট যে সিপিএমের নিচের তলার কর্মীরা এখন আর সক্রিয় নন। কারণ— (১) ভয়-ভীতি (২) নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা এবং (৩) উপার্জনের সংস্থানে ব্যর্থতা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বেকারী রোধে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক দেখাচ্ছেন। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কাজ তো এখন বন্ধ।

অসংগঠিত শ্রমিকদের মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টাকা জমানোর বুদ্ধি দিয়ে 'ভবিষ্যতের সুরাহা'-এর কথা বলেছেন। বামফ্রন্ট বলছে তারা অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। এখন শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে এইসব কথাবার্তার প্রতিক্রিয়া কী হয় সেটাই দেখার।

তুমি আমাকে ভোট দাও, আমি তোমাকে ‘মুক্তি’ কার্ড দেব

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

দিদি,

অনেক জমানো বেদনা জানাতে এই চিঠি। আপনি উন্নয়ন নিয়ে লড়াই করছেন আর আপনার নামে নানা কুৎসা ছড়িয়ে পড়ছে। আপনি তো মেতে আছেন নিজের কাজে। কিন্তু শুনতে হচ্ছে আমাদের। এই যেমন আপনি বীরভুম দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করলেন। এটাকে কেউ ভাল চোখে দেখছে না। সবাই বলতে শুরু করেছে সরকারি খরচে আপনি নাকি পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে নেমে পড়লেন। আপনি বিভিন্ন জানা অজানা পেশার মানুষের মুক্তির জন্য সামাজিক মুক্তি প্রকল্প চালু করলেন ভাল মন নিয়ে। কিন্তু আপনার মা-মাটি-মানুষের লোকজনই বলতে শুরু করেছে এসব ভোটের ভেট।

সত্যি দিদি কষ্ট হয় এসব দেখে। এসব শুনে। আপনি ভেবেছেন যাঁরা মাছের আঁশ ছাড়ান, পাথর ভাঙেন, টিভি-রেডিও সারান, ধান ভাঙেন তাদের কথা। কিন্তু সমালোচকের দল বলতে শুরু করেছে এসব ধান ভানতে শিবের গীত। কাজের কাজ কিছুই হবে না আসলে এসব ভোট চাইবার কল। কিন্তু ওরা জানে না যে এটা সিপিএম নয়, তৃণমূলের সরকার। আর তাঁর নেতৃত্বে আপনি অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সরকার কখনওই ওসব করে না। ভোট চায় না। ভিক্ষা করে না। মানুষ এমনিই ভোট দেয়। তছাড়া সরকারের কাজই তো হচ্ছে সরকারি প্রকল্পের প্রচার করা। সেই প্রচারকে ভোট প্রচার বলে ভাবার কি কোনও মানে হয় বলুন।

সেদিন টিভিতে দেখছিলাম, আপনি বোলপুরে রেলের মঞ্চ থেকে একের পর এক রাজ্য সরকারের প্রকল্প ঘোষণা করলেন। সবাই সমালোচনা করল। আমি বলি, রাজ্যের কথা ভেবেই তো সেটা করলেন আপনি। রেলের খরচে রাজ্যের প্রচার। বঙ্গ সরকারের কত পয়সা বাঁচালেন। ব্লকে ব্লকে হিমঘর, ব্লকে ব্লকে কিষাণ মান্ডি, ব্লকে ব্লকে টেকনিকাল কলেজ, পাড়ায় পাড়ায় স্কুল হাসপাতাল, মাল্টি ফেসিলিটি হাসপাতাল, ঘরে ঘরে দু'টাকা কেজি চাল, জনে জনে চাকরি এসব হোক বা না হোক, স্বপ্নটাই কি কেউ কোনওদিন দেখাতে পেরেছে?

দিদি, আপনার সমালোচকদের কথা আর বলবেন না। ওরা সবেতেই দোষ খুঁজে পায়। এই যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো। প্রণব মুখোপাধ্যায় রাইসিনা হিলসের প্রাসাদে পৌঁছলেন। এই ভোটে তো আপনি প্রার্থীই দেননি। আর ওরা কিনা বলছে রাষ্ট্রপতি ভোটে গো-হারান হেরেছে তৃণমূল। হেরেছেন আপনি। কিন্তু একবার ভাবলই না যে আপনার সঙ্গে প্রণব মুখুজ্যের খুনসুটির সম্পর্কে হারজিতের কোনও ব্যাপারই নেই।

তবে দিদি, আপনাকে একটা খবর দিই। আপনার কানন ভাই কিন্তু আপনাকে ডোবাবে। কলকাতার মেয়র হয়ে কানন মানে শোভন চট্টোপাধ্যায় কিন্তু ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। প্রথম প্রথম রাইটার্সে দিনরাত ঘুর ঘুর করত। আপনি পছন্দ না করায় এখন নিজের মনে রাস্তায় রাস্তায় আলোকস্তম্ভ বসিয়ে চলেছে। আপনাকে খুশি করতে কদিন আগে কলকাতায় নীল-সাদা রঙ লাগাচ্ছিল। তিলোত্তমাকে নীলোত্তমা করার কাজ মাঝ পথে থামিয়ে এখন আলোর খেলা দেখাচ্ছে। আলো নিয়ে দুর্নীতির আঁধার নামিয়েছে।

সত্যি মিথ্যে জানি না, সমালোচকরা বলছে, বিশেষ এক ব্যবসায়ীর থেকে টেন্ডার ছাড়াই নীল আর সাদা রঙ কেনা হয়েছিল। এখন আলোকস্তম্ভের ক্ষেত্রেও বেচারা কাননের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কয়েক মাস আগেই কলকাতার রাস্তাকে ট্রাইডেন্ট আলোয় সাজাতে উদ্যোগ নেন তিনি। ২৭ কোটি টাকা খরচও হয়েছে। কিন্তু জানেন দিদি, কানন এবারও ওঁর এক বন্ধু সংস্থাকে টেন্ডার ছাড়াই সেই বরাত পাইয়ে দিয়েছে। যেখানে দরকার নেই সেই আলোকজ্জ্বল এলাকাতেও ঘন ঘন বাতিস্তম্ভ বসিয়েছে। এমনকি ভেপার ল্যাম্পের চড়া আলোর নিচেই বসেছে নতুন ট্রাইডেন্ট ল্যাম্পের সাদা হালকা লাইট।

দিদি, যেহেতু কানন আপনার স্নেহধন্য তাই সবাই বলছে আপনি নাকি জেনেশুনেও চুপ করে আছেন। কিন্তু আমি জানি, আপনি সেটা করতেই পারেন না। অন্যায় দেখলে আপনি মুখ খুলতেনই। এমনিতে পুরসভার নিয়ম বলছে ৫ লাখ টাকার বেশি খরচ হলেই টেন্ডার ডাকতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ২৭ কোটি টাকা খরচের আগে কোনও টেন্ডার ডাকেনি কলকাতা পুরসভা। তবে দিদি, আপনার ভাই কানন একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ২৭ কোটি টাকা খরচকে ভেঙে ভেঙে ৫৪০টা বিল করে দেখিয়েছে। প্রত্যেকটাই ৫ লাখ টাকার কম। সুতরাং আইন আপনার মহানাগরিক ভাইকে ছুঁতেও পারবে না।

—সুন্দর মৌলিক

রাজ্যের উন্নয়নে প্রয়োজন গ্রামবাসীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি

দেবব্রত চৌধুরী

কোনও রাজ্যে শিল্প স্থাপনের সময় প্রথম যে বিষয়টি দেখা হয় সেটি হলো স্থানীয় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অন্য অনেক রাজ্যের থেকে কম। কয়েক বৎসর আগে State Planning Commission-এর সভাপতি মান্যবর ডঃ অজিতনারায়ণ বসু (বর্তমানে প্রয়াত) তাঁর 'পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি'-তে লিখেছিলেন এ রাজ্যে 'খাদ্য-বস্ত্র' বাবদ খরচ করে একজন মাত্র ৬ টাকার ভোগ্যপণ্য কিনতে পারেন।

১৯৯১ সালে বাজার নীতি গ্রহণের পর দেশের প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১২৩ কোটি-এর মাত্র ২৫ শতাংশ মানে প্রায় ৩০ কোটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে শিল্পদ্রব্য-ভোগ্যপণ্য কিনতে পারে। সংসারের জীবন ধারণের সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তারা জনপ্রতি প্রায় ১০০০ টাকার পণ্য বা শিল্পপণ্য কিনতে পারেন অর্থাৎ প্রায় ৩০০০০ টাকার বাজার আছে ভোগ্যপণ্যের ভারতবর্ষে।

সমীক্ষায় জানা গেছে আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩ কোটি মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া জোগাড় করতে পারেন না। ডঃ জয়ন্তী পট্টনায়ক (সমাজবিষয়ক গবেষিকা), জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তাঁর এক রিপোর্টে লিখেছেন— পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৩ লক্ষ লোক দৈনিক অনাহারে থাকেন। বর্তমানে রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ৯.১৩ কোটি। এদের সবার সামনে ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা নেই। অজিতনারায়ণ বসুর মত অনুযায়ী মাত্র ৫৪.৭৮ কোটি টাকার মতো ভারতের ভোগ্যবাজারের মাত্র প্রায় ০.২০ শতাংশ। স্থানীয় স্তরে মাত্র ০.২০ শতাংশ বাজারের লোভে কি কোনও শিল্পপতি এরাজ্যে আসতে আগ্রহ দেখাবে!

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ রাজ্যের ৩৮,০০০ গ্রামে থাকেন। অর্থাৎ প্রায় ৬.৫ কোটি মানুষ গ্রামেই থাকেন। রাজ্যের প্রায় ২.৫ কোটি, মানুষ দারিদ্র্যসীমার (BPL) নীচে আছেন। এর সিংহভাগই গ্রামবাসী। গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটাতে পারলে এদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে না। কোনও শিল্পপতি এরাজ্যে আসতে চাইবে না।

যতক্ষণ না স্থানীয় মানুষের মধ্যে ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা বাড়ানো যাবে ততক্ষণ কোনও শিল্পপতি এরাজ্যে পুঁজি লগ্নী করতে আসবে না।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ রাজ্যের ৩৮,০০০ গ্রামে থাকেন। অর্থাৎ প্রায় ৬.৫ কোটি মানুষ গ্রামেই থাকেন। রাজ্যের প্রায় ২.৫ কোটি, মানুষ দারিদ্র্যসীমার (BPL) নীচে আছেন। এর সিংহভাগই গ্রামবাসী। গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটাতে পারলে এদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে না। কোনও শিল্পপতি এরাজ্যে আসতে চাইবে না। বর্তমানে State Domestic Product (SDP) কৃষি বাবদ আসে মাত্র প্রায় ২০ শতাংশ। তাই শুধু

কৃষি নির্ভর হয়ে থাকলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে না। গ্রামের মানুষের আয় বাড়াতে হবে। গান্ধীজী গ্রামের মানুষের উদ্দেশে বলেছিলেন—"I am a farmer and I am a weaver." অর্থাৎ কৃষি ছাড়াও অন্য কাজ করতে হবে। একটি চাষী ও কৃষিশ্রমিকের বছরে ১৮০ দিন থেকে ২০০ দিনের বেশি কাজ নেই। কিন্তু বছরে সংসার চালাতে হয় ৩৬৫ দিন অর্থাৎ বছরে ১৬৫ দিন সে বেকার থাকে।

এন ডি এ সরকার বলেছিল বছরে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা মনে করি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এন ডি এ সরকার বছরে ১ কোটিরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছিল, বিশেষ করে গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের। এন ডি এ সরকার এটি করতে পেরেছিল 'শ্রমদিবস' সৃষ্টির মাধ্যমে। আবার এই 'শ্রমদিবস' মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছিল সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশের। এর জন্য এন ডি এ সরকার তৈরি করেছিল স্বর্ণচতুষ্কোণ মহাসড়ক যোজনা, গ্রামসড়ক যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা, বাল্মিকী আবাস যোজনা, গ্রামীণ রোজগার যোজনা, পানীয় জল প্রকল্প, লঘু সেচ প্রকল্প, ত্বরান্বিত সেচ সুফল কর্মসূচী, নদীভাঙ্গন রোধক কর্মসূচী ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ণে প্রয়োজন হয় প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকের, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি একটি প্রকল্প রূপায়ণে প্রয়োজন হয় ৩০,০০০ কোটি টাকা এবং একজন শ্রমিকের 'রোজ' যদি ১৮০ টাকা হয়, তাহলে বেকার থাকা প্রায় ২৫০০ কৃষি কর্মীর সারা বছর আয় থাকবে, বাড়বে তার ক্রয়ক্ষমতা, তার গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান হবে উন্নত। সমস্ত প্রকল্পগুলি যদি সরকার বাস্তবায়িত করে তবে কয়েক লক্ষ গ্রামীণ মানুষ তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারবে, রাজ্যস্তরে শিল্পপণ্যের বাজার স্বাস্থ্যবান হবে, শিল্পপতিরাও রাজ্যে লগ্নী করতে আগ্রহী হবে, কারণ লগ্নীকারীদের চরিত্র হচ্ছে বাজার দখল, মুনাফা করা, রাজনীতিবিদদের মনোতুষ্টি নয়।

গ্রামীণ শিল্প স্থাপনে সময় দেখতে হবে স্থানীয় স্তরে কোন শিল্প এসব অঞ্চলে তৈরি হোত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাওড়ায় বৃটিশ আমল থেকেই ঢালাই-মেশিন তৈরি হোত। এখনকার লোক এ জাতীয় শিল্পে উন্নত। কিন্তু বর্তমানে হাওড়া শিল্প অঞ্চল স্তব্ধ। মুর্শিদাবাদে কাঁসার শিল্প ছিল উন্নত, বর্তমানে তাদের নতুন টেকনোলজি শিখিয়ে তাদের জাত ব্যবসায় ফিরিয়ে আনতে পারে। শান্তিপুর-ফুলিয়া তাঁত শিল্পের জন্য জগৎজোড়া নাম। তাদের শিল্পে সরকারের তরফে হাত বাড়াতে হবে। বাঁকুড়ার গামছা আজও বিখ্যাত, কিন্তু আজ তার কদর নেই। তমলুকে সুতা রং করা হোত। আজ প্রায় বন্ধ। এসব অঞ্চলে মানুষদের দিক নজর দিলেই তবে পরিবর্তনকামী সরকারের উদ্দেশ্য সাধন হবে। শুধু স্লোগানে রাজ্যের উন্নতি হবে না।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী গরম মশলা
AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi Garam Masala
SUNRISE PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আলোচকদের 'সু-পরামর্শ' ভারতের স্বার্থের কতটা অনুকূল ?

কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক স্বেদ, রক্ত এবং প্রাণের বিনিময়ে ভারতের সুরক্ষা কর্মীরা পাকিস্তানী জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। পাকিস্তান প্ররোচিত প্রস্তর ছোঁড়া বাহিনীর আন্দোলনও দমন করেছেন। এই পরিবেশে যখন সন্ত্রাসের আক্রোশ কমেছে, দাবী উঠেছে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করা হোক, আফ্‌স্পা তুলে নেওয়া হোক; কেন্দ্রীয় সরকার মনে করলেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক পদক্ষেপের সময় এসেছে। অক্টোবর ২০১০-এ তাঁরা এক আলোচকমণ্ডলী গঠন করলেন, যাঁরা জম্মু-কাশ্মীরের সর্বস্তরের রাজনৈতিক মতবাদের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে, এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ করবেন। তাঁরা প্রায় এক বছর ধরে বিভিন্ন বর্গের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েক সপ্তাহ আগে ১৭৬ পাতার একটি প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। আলোচকদের নেতৃত্বে ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ পাডগাঁওকর, সঙ্গে ছিলেন এম এম আনসারি এবং রাধা কুমার। তাঁদের প্রতিবেদনে তাঁরা যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলি প্রাণিধানযোগ্য।

১৯৫২-র পর থেকে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় আইন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে, রাষ্ট্রের অন্য সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এই কাজের জন্য ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করতে হবে। এই ব্যক্তিরা অবশ্যই জম্মু-কাশ্মীর এবং বাকি ভারতের মানুষের আস্থাভাজন হবেন। সবাই যাঁদের বিশেষ সম্মান করে থাকেন। তাঁরা সেই সমস্ত কেন্দ্রীয় আইন যা এই রাজ্যে প্রযোজ্য করা হয়েছে, বিশ্লেষণ করে তাঁদের পরামর্শ ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন, অর্থাৎ কোনটা বাতিল করা উচিত, কোনটা পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ইত্যাদি করা উচিত। রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করবেন এবং এই আদেশ রাজ্য বিধানসভা সমর্থন জানালে প্রযোজ্য হবে। আলোচকরা কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বলেননি, ভারতের সংবিধানের বাইরে তাঁরা সমস্যা সমাধানের কোন পথ নির্দেশ করছেন! ৩৭০ ধারার বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ— ধারাটির 'অস্থায়ী' আখ্যা বাদ দিয়ে 'বিশেষ ধারা' শব্দটি প্রয়োগ করা হোক। রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনটি নাম রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ করতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের জন্য তিনটি আলাদা আঞ্চলিক সমিতি গঠন করে তাদের রাজ্যের কিছু কিছু আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হোক, যাতে ওইসব অঞ্চলের নাগরিকরা নিজের মতো করে অঞ্চলের বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পান। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রের কোনও আইন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে প্রয়োগ করতে পারবেন না। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ প্রযোজিত সুরক্ষাজনিত বিষয়ে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়েই কেন্দ্রীয় আইন ওই রাজ্যেও প্রয়োগ করা যাবে! এছাড়াও সৈন্য অপসারণ এবং 'আফস্পা' তোলা হবে কিংবা হবে না, সে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

> **জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে সমস্ত অশান্তি, আন্দোলন এবং সন্ত্রাসের ঘটনার অন্তরালে রয়েছে পাকিস্তানের হাত। পাকিস্তানী অর্থ এবং লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উল-দাওয়া, হিজবুল মুজাহিদিন আই এস আই পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ঘটনা জম্মু-কাশ্মীরকে অস্থির করে রেখেছে।**

আলোচকদের সামনে অনেক দাবীই ছিল। যেমনি স্বাধীন জম্মু-কাশ্মীরের দাবী, ইসলামিক রাষ্ট্রের দাবী, ভারতের সংবিধানের বাইরে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের দাবী ইত্যাদি। অর্থাৎ বাস্তব এবং আবেগ তাড়িত দাবী করা হয়েছিল। অনেকে চেয়েছেন সম্পূর্ণ আজাদি, কেউ কেউ ছিলেন পাকিস্তানপন্থী। আজাদি এবং পাকিস্তানপন্থীদের প্রধান সমালোচনা ছিল, ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে সমাধান সূত্র কেন? তাহলে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোনও দিনই রূপ পাবে না। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত ব্যক্তিদের বিষয় বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় আইনগুলির পুনর্বিবেচনা করার জন্য, এমন ব্যক্তিত্ব কি ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে? যাঁদের জম্মু-কাশ্মীর ও ভারতের আপামর জনসাধারণ সেই গরিমার (এস্টিম) দৃষ্টিতে দেখেন? ৩৭০ ধারা নিয়েও তাঁদের প্রশ্ন আছে।

কিন্তু ভারতের সাধারণ মানুষ ওই প্রতিবেদন নিয়ে কি বলছেন? আলোচকমণ্ডলী জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু বাকি ভারতের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে সেই শান্তি আনতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরকে বাকি ভারতের থেকে আরও দূরে নিয়ে গিয়ে সেই শান্তির কোনও মূল্য ভারতের কাছে নেই। পণ্ডিত নেহরু বারংবার সংসদে বলেছিলেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই বাণীর প্রকৃত বাস্তবতা প্রমাণ করতে

ভারত-কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ নিজের প্রাণের বলিদান দিয়েছিলেন। সেই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গকে ভারত থেকে শিথিল করার কোনও অধিকার কারও নেই। আলোচকরা বলেছেন, নিয়ন্ত্রণ রেখা কাশ্মীরের উভয় খণ্ডের মধ্যে মিলন ও সহাযোগিতার রেখা হয়ে উঠুক। এ বিষয়ে ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে এক মন্ত্রীগোষ্ঠী নানা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হবে, তাদের অধিকৃত কাশ্মীরের অংশে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হোক। এ বিষয়টি যে কত অবাস্তব, বিশদে বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

জম্মু-কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় আইন প্রযোজ্য হবে কিনা, বিশেষ করে কোন কোন আইন প্রয়োগ কিংবা বাতিল হওয়া উচিত— এ বিষয়ে নুতন করে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই বিষয়ে ১৯৭৭-এ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা মন্ত্রীদের একটা উপ সমিতি গঠন করে ঠিক এই কাজটাই করতে দিয়েছিলেন। এই সমিতির সদস্য ছিলেন তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মির্জা মহম্মদ আফজল বেগ, ডিডি ঠাকুর, এম কে টিক্কো, জি এম শাহ, এবং জি এন কোচক। দুজন আমলাও ওই সমিতিতে ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইন ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা যেগুলি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়েও বিচার করার দায়িত্ব ওই সমিতিকে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী আইনগুলির পুনর্বিবেচনা করাই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। এই সমিতিকে বলা হয়েছিল, মহারাজ হরি সিং-এর স্বাক্ষর করা ভারত ভুক্তির সনদ, সংবিধানের ৩৭০ ধারা, ১৯৫২-র দিল্লী চুক্তি (কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে), ১৯৭৫-এর শেখ আবদুল্লাহ ও ভারত-সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল (কাশ্মীর এ্যাকর্ড) সেই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে সমিতি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন। প্রথম থেকেই এই সমিতি বিপন্ন হয়, কারণ আফজল বেগকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ডি ডি ঠাকুরের নেতৃত্বে সমিতি কাজ আরম্ভ করার পর জি এম শাহ এবং গোলাম নবি কোচক ঘোষণা করেন, তাঁরা মনে করেন, সমস্ত কেন্দ্রীয় আইন এবং ভারতীয় সংবিধানের যেসব ধারা জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য করা হয়েছে, তা বাতিল করতে হবে। কারণ সেগুলি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম অধিকার খর্ব করেছে। যাই হোক, ডি ডি ঠাকুর (পরবর্তীকালে উপ-মুখ্যমন্ত্রী), জুলাই ১৯৮১-তে তাঁর প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল— ১৯৭৫-এর কাশ্মীর সমঝোতা চুক্তি (কাশ্মীর এ্যাকর্ড) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের গ্রহণযোগ্য নির্ভর হওয়া উচিত। যে সমস্ত আইন ও সংবিধানের ধারা প্রযোজ্য হয়ে গেছে সেগুলিকে বাতিল করা সম্ভব নয়। তবে বিধানসভা যদি কোনও ধারা অথবা আইনের বদল চান তাহলে সেই প্রস্তাব বিধানসভায় পাস করিয়ে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠান সম্ভব। কেন্দ্রীয় আইন অথবা সংবিধানের কোনও ধারা বাতিল করার অর্থ কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া। পাডগাঁওকার সমিতি এবিষয়ে নতুন করে কী বলতে চেয়েছেন বোঝা গেল না।

তবে কট্টরপন্থী হুরিয়ৎ নেতা সৈয়দ আলি শাহ জিলানী হুঁশিয়ারী দিয়ে চলেছেন, কাশ্মীরি যুবকদের তিনি শান্ত করে রেখেছেন (?), তারা আবার অস্ত্রধারণ করতে তৈরি হয়ে রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, পাকিস্তানী সমর্থন অথবা মুজাহিদিনদের সহায়তা তাঁর প্রয়োজন নেই। কাশ্মীরি যুবকরা রাজনৈতিক পরিসর চাইছেন। বর্তমান নির্বাচন তাঁরা মানেন না। সকলেই জানেন, জিলানী সাহেব পাকিস্তানের টাকায় লালিত-পালিত এবং পাকিস্তানের জিহাদি বক্তব্য না শোনালে অন্য অনেকের মতো পাকিস্তানী জেহাদিরা তাকেও বাঁচতে দেবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের দয়ায় আজও তিনি জেলখানার বাইরে রয়ে গিয়েছেন। ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখতে সাহসী হয়েছেন। কিছু কাশ্মীরি যুবক আজও অর্থ লালসায় এবং জেহাদি ভাবধারায় ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছেন। তারাও গ্রেপ্তার হবে।

যে যাই বলুক, একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত, কাশ্মীরের অশান্তি কোনও আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ অথবা দুর্বলতার জন্য নয়। জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকদের, ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্যের নাগরিকদের মতো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে কোনও বিরোধ নেই। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে সমস্ত অশান্তি, আন্দোলন এবং সন্ত্রাসের ঘটনার অন্তরালে রয়েছে পাকিস্তানের হাত। পাকিস্তানী অর্থ এবং লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উল-দাওয়া, হিজবুল মুজাহিদিন আই এস আই পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ঘটনা জম্মু-কাশ্মীরকে অস্থির করে রেখেছে। ওই রাজ্যের মানুষ ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। অন্যথায় ৬০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দিতেন না, ভোট বয়কট হোত। পাকিস্তানী এই সন্ত্রাসের ঘটনা ও নাগরিক আন্দোলন ঘটাতে পারছে আলি শাহ গিলানীর মতো মানুষকে ব্যবহার করে। বিগত প্রায় ৫০ বছর যাবৎ কত পাকিস্তানী অধিকৃত কাশ্মীর থেকে উদ্বাস্তু সেজে কাশ্মীর উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে। জমি কিনে, ব্যবসা ফেঁদে কাশ্মীরি নাগরিক হয়ে গেছে, তার কোনও হিসাব কারও কাছে নেই। পাথর বৃষ্টি হোক অথবা অন্য কোনও বনধ্, হরতাল, অবরোধ হোক, ওইসব কাজে 'সাজানো' কাশ্মীরিদের হাত রয়েছে। এই কাজের জন্যই তারা কাশ্মীরে পাকাপাকি ভাবে বিয়ে-সাদি করে ঘরসংসার পেতে বসেছে। বহিরাগতদের আশ্রয় এবং সহায়তা এরাই দিয়ে থাকে। অতএব শান্তি প্রক্রিয়া রাজনৈতিক পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় আইন অথবা ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারার বিচার বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভ্রষ্টাচার রহিত নির্বাচন পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা-রাজ্যসভা পর্যন্ত সমাধা করা, আরও বেশি সংখ্যায় ভোটারদের ভোটদানে আহ্বান জানানো, উন্নয়নের প্রক্রিয়া জোরদার করা, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান এবং জেহাদিদের পক্ষে অনুপ্রবেশকে মৃত্যুর সামিল করে তোলা।

পাডগাঁওকার সমিতি বিগত বছর খানেক কাশ্মীরের বহু মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিবেদন দিয়েছেন। তাতে অনেক বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে। কিন্তু আমার অভিমত, কাশ্মীরে অন্ততঃ তিন চার বছর বাস করে, গ্রামেগঞ্জে, শ্রীনগরে বারমুল্লা, উরি, কারগিল সর্বত্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ভিত্তিতে মনে দাঁনা বেঁধেছে। কাশ্মীরের সুফি সম্প্রদায়ের মানুষ, পাকিস্তানিদের একপ্রকার ঘৃণার চক্ষেই দেখে থাকেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাধারণ মানুষ যখন শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, যতবেশি শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে হতে থাকবে কাশ্মীরে অভ্যন্তরীণ সমস্যা তেমন থাকবে না। তবে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে, সুরক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কোনও পক্ষের রায়ে পা দিলে বিপদ হবে। আসলে সন্ত্রাসবাদীদের মদত করার জন্য, রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য সুরক্ষা কর্মী অপসারণের দাবীতে অন্যরা সোচ্চার হচ্ছেন। জেহাদি অনুপ্রবেশ বন্ধ থাকলেই কাশ্মীরে শান্তি থাকবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভূখণ্ড পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নেওয়াই এখন অসমাপ্ত কাজ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তিন মধ্যস্থতাকারী।

কেন্দ্র সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীদের মুখে কাদের ভাষা?

বাসুদেব পাল

কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত মধ্যস্থতাকারী গোষ্ঠীর তাঁদের প্রদত্ত সুপারিশে যে সকল প্রস্তাব দিয়েছেন তা নিয়ে নানা মহলে আপত্তি উঠেছে। এঁদের বক্তব্য, এই প্রস্তাবে সমস্যার সমাধান তো হবেই না উপরন্তু সমস্যা আরও জটিল থেকে জটিলতর হবে।

মধ্যস্থতাকারীরা নিজেরাই কবুল করেছেন তারা কোনও নতুন কথা বলেননি। প্রকৃত ঘটনা হলো— তারা যা বলছেন তা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখের কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বলা যেতে পারে তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবী-দাওয়াকেই সরকারি সীলমোহর প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন মাত্র। এই প্রচেষ্টাতে ওই মধ্যস্থতাকারীদের প্রকৃত মানসিকতা বিষয়েই সন্দেহের উদ্রেক করে। সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক দিলীপ পাডগাঁওকরজীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের মধ্যস্থতাকারী দলকে কেন্দ্র সরকার নিয়োগ করেছিল ১৩ অক্টোবর ২০১১-তে।

স্বাধীনতার পর থেকেই জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্র সরকারের মাথাব্যথা। সমস্যা সমাধানে একের পর এক কমিটি, কমিশন বসানো হয়েছে। সদস্যরা এক বিশেষ মনোভাব নিয়ে দিল্লী থেকে শ্রীনগরে যেতেন, কিছুদিন সেখানে থাকতেন। ন্যাশন্যাল কনফারেন্স (বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে ক্ষমতাসীন) এবং মেহবুবা মুফতির পি ডি পি দলের কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে ফিরে আসতেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্মিলিত সংগঠন অল পার্টি হুরিয়ৎ কনফারেন্সের কোনও কোনও নেতার সঙ্গে তাদের কৃপাবশত দেখাসাক্ষাৎ হলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। এভাবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বললে ভুল হবে।

কিন্তু এবারকার মধ্যস্থতাকারী দলের ভূমিকা একটু আলাদা ছিল। দলের তিনজন সদস্য— বরিষ্ঠ সাংবাদিক দিলীপ পাডগাঁওকর, প্রাক্তন তথ্য কমিশনার এম এম আনসারী এবং শিক্ষাবিদ্ রাধাকুমার নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী। এঁরা বিগত একবছরে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় গিয়েছেন। সাতশ' প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। ওখানের মানুষের দাবী-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ শুনেছেন। এটা একদিক থেকে ভালো।

কিন্তু কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং বিশ্লেষকের প্রথম থেকেই এদের বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিলই। তাঁদের মনে হচ্ছিল এবারও বিশেষ কিছু হবে না। ওই মধ্যস্থতাকারী বার্তাকারদের তিনজনের মধ্যে দু'জনের আই এস আই এজেন্ট ফাই-এর ডাকে ভারত-বিরোধী আলোচনাসভায় যোগ দেওয়াতে তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা কেন্দ্র সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট প্রস্তাবাকারে

জমা দিয়ে দেন।

কেন্দ্র সরকার কয়েক মাস যাবৎ তা চাপা দিয়ে রাখে। প্রায় সাতমাস বাদে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রিপোর্ট সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয় বা প্রকাশ্যে আনা হয়। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে সরকার আলোচনা চাইছে।' তখন সংসদের অধিবেশন শেষের মুখে। যদি সরকার আন্তরিকভাবেই আলোচনা করতে চাইতেন তাহলে ওয়েবসাইটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদেও তা পেশ করে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু সরকার তা করেননি। পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকাতে কৌশল করেছেন— বলা যেতে পারে।

পূর্ব পটভূমি :

১৯৪৭ থেকে জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে রাজনীতি চলছে। সেই রাজনীতির ফলে ভূখণ্ডের একাংশ চলে গিয়েছে পাকিস্তান ও চীনের দখলে। পাকিস্তান তার দখলীকৃত এলাকা আবার উপঢৌকন দিয়েছে বন্ধু ও মদতদার চীনকে। চীন সেখানে স্থায়ী সড়ক বানিয়েছে। সেই রাস্তা ব্যবহার করে চীন থেকে পাকিস্তানে পরমাণু বোমার মালমসলা সরবরাহ করা হচ্ছে।

কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং সবার শেষে করদ রাজ্য থেকে ভারতবর্ষে যোগদান করেন। অন্য সব করদ রাজ্য যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারতে যোগদান করে হরি সিংও সেই একইভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আগ্রহে ৩৭০ ধারা সহ অনেক অবাঞ্ছিত ধারা ও উপধারা সংবিধানে যুক্ত করা হয়। সম্পূর্ণ পাঞ্জাব, সম্পূর্ণ বাংলা এবং মুসলমান প্রধান কাশ্মীর উপত্যকা পাকিস্তানে না যাওয়ায় নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বেশ ক্ষুব্ধই ছিল। মহারাজা হরি সিং টালবাহানা করে দু'মাস কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগে হানাদার জনজাতিদের ছদ্মবেশে পাকিস্তানী সেনা একরকম একতরফাভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করে। তখন একরকম বাধ্য হয়ে মহারাজা ভারতে যোগদান করেন।

এরপর যুদ্ধ। পাক-দখলীকৃত এলাকা মুক্ত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আরও কিছু সময় লাগত। পণ্ডিতজী একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গিয়ে যান। ফলে জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ হয়ে যায় এবং পাকিস্তান সর্বত্র দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অথবা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের বাধা হিসেবে কাশ্মীর সমস্যার প্রসঙ্গ তুলতে থাকে এবং আজও তুলে চলেছে।

১৯৭১ সালে ভারতের সামরিক সাহায্যে পূর্বপাকিস্তান পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। তখন থেকেই জুলফিকার আলি ভুট্টো থেকে শুরু করে আজকের পাকিস্তান নেতৃত্ব ভারতকে উচিৎ শিক্ষা দিতে অবশিষ্ট কাশ্মীরকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রক্সিওয়ার শুরু করে সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে। সন্ত্রাসবাদীদের দাপটে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে পিতৃপুরুষের ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়। তারা এখনও জম্মু, দিল্লী এবং ভারতের অন্যত্র নিজ দেশে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করে চলেছে। ১৯৮৬ থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় ব্যাপকহারে সেনা মোতায়েন করা হয়। হাজারে হাজারে সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের সর্ববিধ সাহায্যে কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মু ক্ষেত্রের রাজৌরি, পুঞ্চ, ডোডা, কিস্তবাড় প্রভৃতি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে।

কেন্দ্রে প্রয়াত নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতে ফিরিয়ে আনাই কাশ্মীর সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে স্বীকার করে নেয়।

কাশ্মীরে সক্রিয় অনেক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর

দিল্লীতে প্রস্তাবের প্রতিবাদে সুষমা স্বরাজ, বিজয় গোয়েল, রামমাধব ও অন্যরা।

সম্মিলিত সংগঠন 'অলপার্টি হুরিয়ৎ কনফারেন্স' স্বাধীনতা দাবী করে আসছে। তারা ভারত সরকারকে চাপ দিয়ে চলেছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসার জন্য। এই তৃতীয় পক্ষ আর অন্য কেউ নয়— তাদের স্বপ্নের 'পাকিস্তান'।

মনমোহন সিং সরকারের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ :

এবার সন্ত্রাসবাদীরা সেনাসহ অন্যসব নিরাপত্তাবাহিনীর মনোবল দুর্বল করতে বালক-কিশোরদের কার্ফু অমান্য করতে পথে নামায়। পুলিশকে লাঠিপেটা এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে কোনও বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হলে ব্যাপক আন্দোলন করে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার সবরকম ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। দাবী ওঠে সেনা প্রত্যাহার এবং সেনাবাহিনীর বিশেষ অধিকার খর্ব করার। এরকম অবস্থায় দুর্বল, আপসকামী, তোষণকারী কেন্দ্র সরকার সন্ত্রাসবাদী তথা উপত্যকার জনগণের সঙ্গে কথা বলার জন্য দিলীপ পাডগাঁওকার-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের মধ্যস্থতাকারী দল নিয়োগ করে।

ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবাকারের রিপোর্ট তৈরিতে মধ্যস্থতাকারীদের পিছনে প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে অভিযোগ। নিঃসন্দেহে বলা যায় ওই পঞ্চাশ কোটি টাকাই জলে গিয়েছে। কেননা, প্রায় সকল পক্ষই (সরকার এবং বিরোধী) ওই রিপোর্ট একেবারে আগাগোড়াই খারিজ করে দিয়েছে।

মধ্যস্থতাকারীদের কিছু সুপারিশ এমন যে তা কার্যকর করতে হলে শুধু সন্ত্রাসবাদী-বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই নয়, পাকিস্তান ও চীনকেও আলোচনায় সামিল করতে হবে। এখানেই কথা শেষ নয়। প্রস্তাবের ভাষা দেখেই মধ্যস্থতাকারীদের পূর্বপরিকল্পনাপ্রসূত মনোভাব টের পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠছে ওই সুপারিশে সরকারের মৌন সম্মতি ছিল কিনা! কেননা, উপর উপর সরকার রিপোর্টকে ঠাণ্ডাবাক্সে পাঠানোর নামে ভিতরে ভিতরে কার্যকর করার প্রয়াস চলতে থাকে। যদি মধ্যস্থতাকারীদের সুপারিশ মেনে নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় তাহলে তা হবে দেশের সার্বভৌমিকতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া।

কেন্দ্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বার্তাকাররা দাবী করেছেন তারা নাকি বিভিন্ন শ্রেণীর ৭০০ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন, তিনটি গোলটেবিল বৈঠক করেছেন। রাজ্যের ২২টি জেলার অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে বার্তাকারদের প্রদত্ত সুপারিশে রাজ্যের তাবৎ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন হয়ইনি। মুষ্টিমেয় বিচ্ছিন্নতাকামী কাশ্মীর উপত্যকাবাসীদের সামনে কেন্দ্র সরকারের দিশাহীন ও হাঁটুগাড়া আত্মসমর্পণকারী নীতিই প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে (বার্তাকারদের প্রস্তাব) একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— জম্মু ও লাদাখের জনগণ, শিয়া মুসলমান, গুজ্জর মুসলমান, পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আগত উদ্বাস্তু, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী, ১৯৯০ সালে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে নিজদেশে উৎখাত হওয়া কাশ্মীরী পণ্ডিতদেরকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি।

মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাবের বিশেষ কিছু উদ্ধৃতাংশ :

- কাশ্মীর উপত্যকায় বর্তমান দমন-পীড়নের (সরকারি) গভীরভাবে সমীক্ষা ও বিবরণ দেখে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রস্তাব করেছি। এরকম সংবেদনশীল বিষয়ে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন। একইসঙ্গে কোনও একটি এলাকার এক বিশেষ ধর্মীয়দের কষ্ট দেওয়ার অসংখ্য মামলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি।
- একটি অকর্মণ্য এবং দায়িত্বহীন প্রশাসন থেকে মুক্তি দিতে হবে।
- সামাজিক পরিকাঠামো ও নীতি থেকে মুক্তি— যে কারণে সংখ্যালঘু (মুসলমান) মহিলাদের কষ্ট দেওয়া হয়।
- প্রচার মাধ্যম, সাংবাদিক, তথ্যের অধিকার সম্পর্কিত কার্যকর্তা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে সক্রিয় গোষ্ঠী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে সবরকম চাপ থেকে মুক্ত রাখা।
- ১৯৫২ সালে ভারতীয় সংবিধান প্রযোজ্য হওয়ার পর রাজ্যে কার্যকর সংবিধানের সবক'টি অনুচ্ছেদ এবং কেন্দ্রীয় অধিনিয়মের সমীক্ষার জন্য সাংবিধানিক সমিতি গঠন করা হোক। এবং সমিতি গঠনের ছ'মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে।
- সংবিধানের ৩৭০ ধারার আগে 'অস্থায়ী' শব্দটি তুলে দিয়ে অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে চালু ৩৭১ (মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট), ৩৭১ এ (নাগাল্যান্ড), ৩৭১ বি (অসম), ৩৭১ সি (মণিপুর), ৩৭১ এফ (সিকিম), ৩৭১ জি (মিজোরাম), ৩৭১ এইচ (অরুণাচল), ৩৭১ আই (গোয়া)-এর মতো স্থায়ী করতে হবে।
- জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের দ্বৈতচরিত্রের কথা মনে রাখতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরের জনতা একইসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ও ভারত— দুটি ক্ষেত্রের নাগরিক ৩৭০ ধারার কারণে। সেজন্য রাজ্যে ভারতীয় সংবিধান যা সংশোধন সহ অথবা সংশোধন ছাড়া প্রয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে জম্মু-কাশ্মীরে বিপরীত প্রভাব পড়েছে এবং রাজ্যের জনকল্যাণকারী সরকারের ক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে তার সমীক্ষা করে দেখতে হবে।

সবমিলিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের সুপারিশ বা প্রস্তাবে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের মুখের কথাই যেন ভাষা পেয়েছে। প্রস্তাব প্রকাশ্যে আসা মাত্র কেন্দ্রে প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি ওই প্রস্তাবকে আগাগোড়া খারিজ করার দাবী জানিয়েছে। বিভিন্ন দেশভক্ত সংগঠন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিনে (৬ই জুলাই) ভারত জুড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, পথসভা করেছে। চাপে পড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এই প্রস্তাবকে 'সরকারের নয়' বলে ঘোষণা করে কোনওরকম পদক্ষেপ এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন। এখন ভবিষ্যত বলবে দেশের একতা, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে আর কতদিন বোঝাপড়া করা হবে ভারত বিরোধী শক্তি ও কণ্ঠস্বরকে কেন্দ্র কতটা মদত দেবে এবং দিয়ে চলবে। সকল স্বদেশভক্ত ভারতীয়দের এই বিষয়ে সজাগ থেকে জোর গলায় প্রতিবাদ একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

‘চেপে রাখা ইতিহাস’-এ হিন্দুদের কুৎসাকীর্তন

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

সম্প্রতি গোলাম আহমদ মোর্তজা লিখিত ‘চেপে রাখা ইতিহাস’ গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। ৩৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির প্রকাশকাল ১৯৮৬ এবং ২০০৬-তেই দশম মুদ্রণ হয়েছে। বইটির নামকরণের মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে কষ্ট হয় না। লেখক হিন্দু রাজনীতিকদের দোষ ত্রুটি যা চেপে রাখা হয়েছে এবং মুসলিম রাজনীতিকদের গুণ যা হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এড়িয়ে গেছেন তা তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই কাজে তিনি অজস্র কম্যুনিস্ট ও ভুয়ো-ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে সাহায্য পেয়েছেন, ফলে তাঁর চেপে রাখা ইতিহাস-এর গুপ্ত দরজা খুলতে অসুবিধা হয়নি।

তিনি শুরু করেছেন ইসলামের উদ্ভব থেকে। হিন্দু চিন্তাবিদেরা ইসলাম সম্বন্ধে যে দুটি কথা প্রায়শই বলে থাকেন তা হলো ইসলাম অগণতান্ত্রিক ও তরবারির উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখক এই যুক্তি ভুল বলে দাবী করেছেন এবং এ বিষয়ে শান্তিভূষণ বসু, সুরজিত দাশগুপ্ত প্রভৃতি গবেষকদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শান্তিভূষণ বসু, সুরজিত দাশগুপ্ত প্রভৃতি গবেষকেরা কি জানেন না যে ইসলামে নারীকে বোরখার মধ্যে রাখা হয়েছে, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আরব ও যারা আরব জাতিভুক্ত নয় তাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য করে রাখা হয়েছে। পার্থক্য করে রাখা হয়েছে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে। পবিত্র কোরাণে ও হাদিসে অমুসলিমদের ‘কাফের’ বলে শুধু অপমান নয় তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লেখক মোর্তজা সাহেব এই ইতিহাস চেপে গেছেন। আবার এ কথাও সত্য যে দেশ জয় করে মুসলিম নতুন শাসক ‘হয় ইসলাম নয় মৃত্যু’ এই ফরমান দিয়ে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষকে ইসলাম ধর্ম নিতে বাধ্য করেছেন। সুলতানি আমল থেকে মোগল আমল পর্যন্ত কেউ এর ব্যতিক্রম নন। কেউ কম কেউ বেশি। ডঃ বি আর আম্বেদকর যিনি মোটেই হিন্দুদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি তাঁর ‘পাকিস্তান অর পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে লেন পুল প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন

সোমনাথ মন্দির

> সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছেন এবং ভেঙে তছনছ করেছেন। এ জন্য তিনি দুঃখিত বা লজ্জিত নন, তিনি এই অপকর্মকে ‘রাজনৈতিক’ আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের যে কোনও মুসলিম মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য শিল্প, যেমন কুতুবমিনার-পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাদের গাত্রে হিন্দু দেব-দেবীর ভাঙা মূর্তি সাঁটা আছে।

মুসলিম রাজারা কী ভীষণ অত্যাচার করে হিন্দু প্রজাদের মুসলমান ধর্ম নিতে বাধ্য করেছিলেন। অন্য কারোর সাক্ষ্য নয় স্বয়ং সুলতান মামুদ, বাবর প্রভৃতি তাঁদের আত্মজীবনীতে কাফেরদের দেশের উপর ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছেন বলে শ্লাঘা প্রকাশ করেছেন। চেপে রাখা ইতিহাস উন্মোচন করতে গিয়ে মোর্তজা সাহেব এই ইতিহাস গোপন করেছেন।

মোর্তজা সাহেব সৈয়দ আহমদ বরেলি, সৈয়দ নিশার আলী (তিতুমীর)-দের আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলেছেন— তাঁর যুক্তি তাঁরা ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে লেখক অমলেন্দু দে, সুপ্রকাশ রায়-দের সাহায্য নিয়েছেন। যে সত্য ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো এঁরা ভারত থেকে ইংরেজ

সরকারকে বিতাড়িত করে আবার মুসলিম রাজ্য বা 'দার-উল-ইসলাম' কায়েম করতে চেয়েছিলেন যেখানে হিন্দুরা আবার হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা 'জিম্মি'। এঁরা একসঙ্গে হিন্দু ও ইংরেজ দু-পক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সৈয়দ আহমদ বরেলি বিপুল মুসলিম মোজাহিদ বাহিনী নিয়ে রণজিৎ সিং-এর রাজ্য আক্রমণ করেন, কলকাতায় তৎকালীন ইংরেজ কোম্পানীর রাজধানী কলকাতা নয়। উপরন্তু তিনি তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে' হিন্দুদের সাহায্য নেননি। তিতুমীরও তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে' কোনও হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন বলে কোনও ঐতিহাসিক রায় দেননি। অমলেন্দু দে, সুপ্রকাশ রায়রাও নীরব। এঁরা সেদিন আরব থেকে শুরু ওয়াহবি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মোর্তজা সাহেব ওয়াহবি আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন, যেটা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন সেটা হলো ওয়াহবি আন্দোলন ইউরোপে ছিল কট্টর খৃস্টান ও ইহুদি বিরোধী আন্দোলন আর ভারতে কট্টর হিন্দু বিরোধী আন্দোলন। W.W. Hunter তাঁর The Indian Musalmans গ্রন্থে লিখেছেন কী ভয়াবহ ছিল এই ওয়াহবিদের হিন্দু বিরোধী জিগির। লেখক এটি সুন্দর ভাবে চেপে গেছেন। সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছেন এবং ভেঙে তছনছ করেছেন। এ জন্য তিনি দুঃখিত বা লজ্জিত নন, তিনি এই অপকর্মকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের যে কোনও মুসলিম মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য শিল্প, যেমন কুতুবমিনার-পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাদের গাত্রে হিন্দু দেব-দেবীর ভাঙা মূর্তি সাঁটা আছে। মোর্তজা সাহেবের ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে গেছে যখন তিনি আকবর- ঔরংজেব-শিবাজি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের নীতি তাঁর পছন্দ হয়নি। আধুনিক যুগের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর কোরান-হাদিসের অনেক বিধি-নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভেঙেছেন। 'বিশ্বের মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ 'ঈদুল আজাহাতে' গোরু নয়, উট ইত্যাদি পশুর জবাই সিদ্ধ। ঔরংজেব যিনি হিন্দু-শিখদের উপর অত্যাচার করেছেন, অজস্র হিন্দু মন্দির ভেঙেছেন লেখকের মতে 'এ সব ঝুটা হ্যায়'। এ ক্ষেত্রে তিনি ভিনসেন্ট স্মিথ, লেন পুল, যদুনাথ সরকারদের সাক্ষ্য নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর মতে শিবাজী রাষ্ট্রদ্রোহী। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁর বিদ্বেষ উগরে দিয়েছেন। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজের শ্রেষ্ঠতম অনুগত'— ঋষি নন, সাম্প্রদায়িক। তিনি মুসলমানদের নেড়ে এবং কাক-কুকুরদের সমতুল্য বলেছেন। তাঁর মুসলমানদের প্রতি নেড়ে, কাক-কুকুরদের সমতুল্য ইত্যাদি উক্তি আমরা সমর্থন করতে পারি না, কিন্তু তিনি তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধে মুসলিমদের যে তীব্র সমালোচনা করেছেন তা সৈয়দ আহমদ বরেলি, তিতুমীর প্রভৃতি ওয়াহবি নেতাদের তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের ফলশ্রুতি। ওয়াহবি নেতারা হিন্দুদের আক্রমণ উপলক্ষে যে নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি সংকলন করলে প্রতিভাত হবে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিমদের সম্বন্ধে উক্তি সে তুলনায় কত স্বচ্ছ ও মার্জিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পূর্বজ থেকে শুরু করে গোটা উনিশ শতক ধরে ওয়াহবিরা তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ উদ্‌গীরণ করেছেন, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়েছেন; তাতে ধুনো দিয়েছেন স্যার সৈয়দ আহমেদ, আব্দুল লতিফ প্রভৃতি নেতারা। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ প্রমুখ নেতারা এসব দেখেও নিশ্চুপ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চুপ থাকতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার সুবাদে সারা বাংলায় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। এবং ক্ষুব্ধ হয়ে কলম ধরেছিলেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনের সেই উক্তি মনে পড়ে : প্রতিটি ক্রিয়ার সমান প্রতিক্রিয়া আছে। ওয়াহবিরা এবং সৈয়দ আহমেদ, আব্দুল লতিফ প্রভৃতি নেতারা হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াতে পারবেন তাতে দোষ নেই, দোষ শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের?

এমন লেখক মহম্মদ আলি জিন্নার প্রশংসা করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর মতে যদি জিন্নার দাবিগুলি মেনে নেওয়া হোত তাহলে ভারত ভাগ হোত না। মোর্তজা সাহেব এ ব্যাপারে বিশিষ্ট লেখক বিমলানন্দ শাসমলের 'ভারত কী করে ভাগ হলো' গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। জিন্নার দুটি প্রধান দাবী ছিল— পার্লামেন্টে হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিত্ব হবে সমান সমান— অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ হিন্দুর জন্যও সেকটি আসন থাকবে ২৫ শতাংশ মুসলিমের জন্য সে কটি আসন থাকবে। দ্বিতীয় দাবী কংগ্রেসী নেতারা তাঁদের দলের মুসলিম সদস্যদের পার্লামেন্টে পাঠাতে পারবেন না, কিন্তু জিন্না তাঁর দলের বা সহযোগী দলের অমুসলিম সদস্যদের পার্লামেন্টে পাঠাতে পারবেন বা মন্ত্রী করতে পারবেন— যেমন তিনি মন্ত্রী নির্বাচন করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। এই যুক্তি কি মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব ছিল?

লেখক আরেকটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে বাঙালি হিন্দুরা মুসলিমরা যাতে যোগ্য স্থান না পায় তার জন্য বাংলা ভাগে মেতেছিল। এই উক্তি করতে গিয়ে তিনি আম্বেদকর ও বিমলানন্দ শাসমলের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু তিনি একবারের জন্য বললেন না ফজলুল হক, হাসান সুরাবর্দি তাঁদের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে দশ বছর ধরে কীভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে ছিলেন, ইসলাম নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী তাদের 'জিম্মি' করে রেখেছিলেন, সমস্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে কলকাতায় ও নোয়াখালিতে দাঙ্গা বাধিয়ে দেন। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য হিন্দুরা বঙ্গ বিভাগ চেয়েছিল। লেখক এই সত্যটি বেমালুম চেপে গেছেন। লেখকের জঙ্গী তালিবানী সম্প্রসারণবাদ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের পুস্তক 'দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই'-এর সমালোচনায়। রায় মহাশয় লিখেছিলেন (১৯৮২-৮৩ সালে)—'গত এক বছরে কাশ্মীরে তিনশো হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়েছে', 'ব্যাপকভাবে হিন্দুদের গণহারে ধর্মান্তর করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর থেকে কোটি কোটি টাকা আসছে', 'পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাংলাদেশ থেকে এসেছে' ইত্যাদি। এই মন্তব্যগুলি সাম্প্রদায়িক? কাশ্মীর সরকারের সক্রিয় সমর্থনে হিন্দু মন্দির ধ্বংস হচ্ছে এই সত্য কথা বলা অপরাধ? ব্যাপকভাবে হিন্দুদের গণধর্মান্তর করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর থেকে কোটি কোটি টাকা আসছে— এই সরকার সমর্থিত কথা বলা দোষের? সারা ভারতে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ থেকে ঢুকে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করেছে এটা বলা কি গুনাহ্? এই ধরনের উক্তি তো যে কোনও দেশের বুদ্ধিজীবীরা করতে পারেন তাঁদের দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে। এর বিপরীত উক্তি করেন তো দেশ বিরোধীরা।

এই রকমই মোর্তজা সাহেব তাঁর 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থের পাতায় পাতায় সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাবনার মূলে আছে একটি সুর : হিন্দুরা সর্ব দোষে দোষী, কেননা তারা কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী।

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ১১

নবগ্রামের মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

চৈতন্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন শৈলীর উদ্ভূত মন্দিরগুলির বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর সন্নিহিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব অংশের নানা স্থানে যতটা সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, পূর্ব ও দক্ষিণ মেদিনীপুরে ততটা লক্ষ্য করা যায় না। পূর্ববর্তী রচনায় এ সম্পর্কে কিছুটা বলা হয়েছে।

ঘাটাল থানার একটি অখ্যাত স্থানে একটি প্রাচীন সুন্দর 'টেরাকোটা' অলংকৃত মন্দিরের সন্ধান আমরা বহু বছর আগে পেয়েছি। ঘাটাল- চন্দ্রকোণা রোডের ঠিক পাশে না হয়েও এবং নবগ্রাম একটি ছোট্টগ্রাম হলেও এখানকার সদ্‌গোপ জাতীয় 'রায়' পরিবারের সিংহবাহিনীর সুদৃশ্য 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি উৎকৃষ্ট মানের 'টেরাকোটা' মূর্তি সমন্বিত। ইঁটের তৈরি এই মন্দির ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত এই সুদৃশ্য মন্দির ভগ্ন ও জীর্ণদশায় উপনীত হলেও দেওয়ালের সামনে 'টেরাকোটা' ফলকগুলি (লেখকের পরিদর্শনের সময়) অক্ষত ছিল। সামনে পোড়ামাটির লিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার এখানে দেওয়া হলো : 'শকাব্দা ১৬৩১ সাল/ফাল্গুনস্য...'। প্রতিষ্ঠাতার কোনও নাম আছে কি না অস্পষ্ট লেখা থেকে তা জানা যায় না।

মন্দিরটির সামনে 'ত্রিখিলান' প্রবেশ পথের ওপরের তিন প্রস্থে, কার্নিশের নীচে ও দু-পাশে পোড়ামাটির বহু মূর্তি সন্নিবেশিত। মূর্তিগুলি ছোট ছোট ফলকে ছাঁচে তৈরি। ভিত্তিবেদী সংলগ্ন দেওয়ালের 'প্যানেল'গুলিতে সেকালের কয়েকটি সামাজিক দৃশ্যপট চিত্তাকর্ষক। যেমন, বনে শিকারদৃশ্য, কয়েকজন প্রহরীসহ

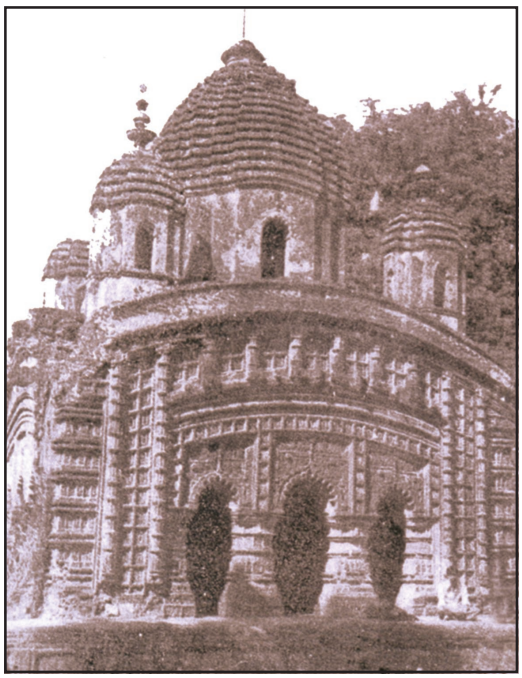

রায়েদের সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন', নবগ্রাম (ঘাটাল)।

শৃঙ্খলিত বন্দী প্রভৃতি দৃশ্য। এরূপ কয়েকটি ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া গায়িকা, সন্ন্যাসী, বাদক প্রভৃতির সুন্দর টেরাকোটাও লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি টেরাকোটা ফলকের প্রতিকৃতি দেউলের মধ্যে শঙ্খবাদনরতা নারীমূর্তিও উল্লেখযোগ্য। জনৈকা নারীকর্তৃক টিয়াপাখিকে আহারদান দৃশ্যটিও সুন্দর।

সামাজিক দৃশ্য ছাড়া রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী অবলম্বন করে কয়েকটি 'টেরাকোটা' ফলক আছে। লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্যের মধ্যে রাম-রাবণের সুপরিচিত যুদ্ধদৃশ্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য। দু-পাশের ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণ, পূতনা বধ, ধেনুকাসুর বধ, লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি দৃশ্য আকর্ষণীয়।

উল্লেখযোগ্য, 'টেরাকোটা' ফলক ছাড়াও ত্রিশটির মতো স্লেট পাথরের ফলকে নানা দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। সংকীর্তনের এক সুন্দর দৃশ্য স্লেট্‌পাথরের একটি ফলকে লক্ষ্য করা যায়।

এই মন্দিরটির কারুকার্য খুবই সুন্দর। আলখাল্লা পরা কতগুলি ছোট ছোট মূর্তিও এখানে আছে। মন্দিরের উত্তর দিকের বাইরের দেওয়ালে তিনটি 'প্রতিকৃতি'। বন্ধ দরজায় পোড়ামাটির কিছু ফুল আছে। মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণে গর্ভগৃহের বাইরে ঢাকা বারান্দা থাকলেও উত্তর ও পশ্চিমে এরূপ কোনও বারান্দা নেই। বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে পূর্বে দোতলায় যাওয়া যেত। বহুকাল ধরে তা ভগ্ন।

রায়েদের পূর্বপুরুষ পিতল-কাঁসার ব্যবসায়ে সেকালে খুবই ধনী হয়ে উঠেছিলেন। সে সমৃদ্ধি বহুকাল নেই।

এই অঞ্চলে একসময় চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহী জমিদার শোভা সিংহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শোভাসিংহের বরদার বিশাল গড় এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এই স্থানের কিছু পশ্চিমে বীরসিংহ যাওয়ার পাকা রাস্তা। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোডে রাধানগরের গোপীনাথের পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ওই মন্দিরটি ১৭১৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত মন্দিরটি পাথরের তৈরি। নবগ্রামের মন্দিরটি ইঁটের তৈরি হলেও তার পূর্ববর্তী। এখানে এখনও সিংহবাহিনীর পুজোপাট হয়। শোভা সিংহের বিদ্রোহের (১৬৯৫-৯৬ খৃস্টাব্দ) কয়েক বছর পরে মন্দিরটি নির্মিত হয়। স্থাপত্য ও কারুকার্যের জন্য প্রাচীন এই মন্দিরটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। □

পৌরাণিক নগর

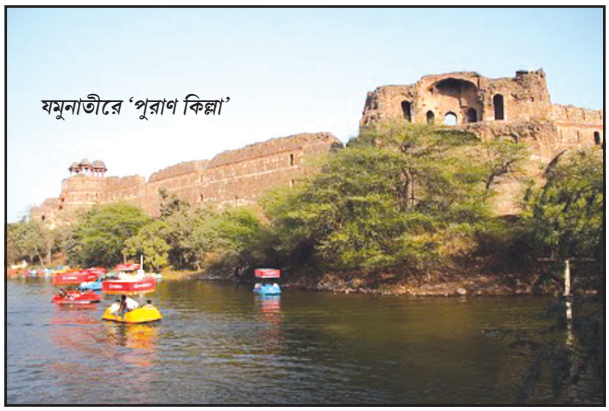

যমুনাতীরে ‘পুরাণ কিল্লা’

ইন্দ্রপ্রস্থ

গোপাল চক্রবর্তী

মহাভারতে আদিপর্বের রাজ্যলাভ পর্বাধ্যায়ে আছে, দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করে কুরুরাজধানী হস্তিনাপুরে (বর্তমান মিরাট) ফিরে এলে ভীষ্ম-বিদুরাদির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র তাদের অর্ধরাজ্য দিয়ে যমুনাতীরে খাণ্ডব প্রস্থে নতুন রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে বলেন। যুধিষ্ঠির সেই অনুসারে চারভ্রাতা এবং দৌপদী-সহ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করেন। কিন্তু খাণ্ডবপ্রস্থ হিংস্র জীবজন্তু সংকুল, বসবাসের অযোগ্য বিশাল অরণ্য। যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে খাণ্ডববন দহন করে সেখানে এক মনোরম নগর নির্মাণ করান। সেই নগরের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, নামান্তর ইন্দ্রপত্, ইন্দ্রপত্ত, ইন্দ্রপতন, ইন্দ্রস্থান এবং খাণ্ডবপ্রস্থ। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মাণ প্রসঙ্গে একটি আখ্যান আছে। খাণ্ডববনে দানবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুত্র। খাণ্ডব দহনের সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের আনুকূল্যে অগ্নির গ্রাস থেকে রেহাই পান। কৃতজ্ঞ ময়দানব জীবনদাতাদের সন্তুষ্টির জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

অপূর্ব সৌধমালা শোভিত পরিখাপ্রাকার বেষ্টিত, উপবন সরোবর ভূষিত স্বর্গধামতুল্য এই নগর কালক্রমে পুরাণ সাহিত্য এবং ইতিহাসে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভাগবত পুরাণে যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের পত্তন এবং যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন আরোহণের পর পাণ্ডবদের অন্যতম কীর্তি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যুধিষ্ঠির ‘একরাট’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পদ্মপুরাণে আছে ত্রিদশাধিশ ইন্দ্র এই স্থানে সুবর্ণ যুপ দ্বারা অনেক যাগযজ্ঞ করেছিলেন। এবং সেই সমস্ত যজ্ঞে নারায়ণের সমক্ষে ব্রাহ্মণদের বহু রত্নপ্রস্থ দান করেছিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ। কথিত আছে এই স্থানে মৃত্যুবরণ করলে মানুষ ও প্রাণী পুনর্জন্মের হাত থেকে রেহাই পায়। জাতকে বলা হয়েছে ইন্দ্রপত্ত বা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের আয়তন সাত যোজন। মধ্যযুগের সূচনাতেও ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে সমাদৃত হোত বলে জানা যায়।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ থেকে কুরুকুলের ‘অভিপ্রতারিণ’ শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের সময়ে নানা ঘটনা ঘটে যার জন্য কুরুকুলের পতন ঘনিয়ে আসে। রাজা অভিপ্রতারিণের পুরোহিত দৃতি ছিলেন কাক্ষসেনের পুত্র যিনি খাণ্ডবে একটা যজ্ঞ করেন। ওই ব্রাহ্মণেই অভিপ্রতারিণদের অন্যান্য কুরুদের চেয়ে অশেষ ক্ষমতাশালী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে—অভিপ্রতারিণ ও তাঁর বংশধরদের সময়ে বিখ্যাত জন্মেজয় গত হয়েছেন। অভিপ্রতারিণের বংশধরেরা অন্যান্য কুরুরাজ পরিবারের চেয়ে অধিক দীপ্তিমান। এই বংশের পৃথক শাখার কথাও বলা হয়েছে। এদের একশাখা প্রথমে হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতো, পরে তারা কৌশাম্বীতে চলে যায়। পুরাণে এই শাখার কথাই উল্লেখ হয়েছে। অন্য একটি শাখা ইক্ষুকারতে রাজত্ব করতো। তৃতীয় শক্তিশালী শাখাটি খাণ্ডব অঞ্চলে রাজত্ব করতো। মহাভারত অনুসারে এই অঞ্চলই ছিল বিখ্যাত নগর ইন্দ্রপ্রস্থ। বৌদ্ধজাতক অনুসারে যুধিষ্ঠির কুলের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। দশ-ব্রাহ্মণ জাতক অনুসারে যুধিষ্ঠির বংশের একজন রাজা এখানে রাজত্ব করতেন এবং নগরটার নাম ছিল ‘ইন্দ্রপট্ট’।

বর্তমান ফিরোজশাহ কোটলা এবং হুমায়ুনের সমাধি-সৌধের মধ্যবর্তী স্থানে যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কোনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন ‘পুরাণ কিল্লা’ কোনও প্রাচীনতর হিন্দুস্থাপত্যের উপরে নির্মিত হয়েছিল বা তারই রূপান্তর। আবার অনেকের ধারণা ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যমুনাতীরবর্তী নিগমবোধ ঘাট এখনও প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের পবিত্র মহিমার ঐতিহ্য বহন করছে। গাহরবাল নৃপতি চন্দ্রদেবের চন্দ্রাবতী শিলালেখ (বিক্রমসংবৎ-১১৪৮ খৃস্টীয় ১০৮৯/৯০ অব্দ) থেকে জানা যায় যে একাদশ শতকেও ইন্দ্রস্থান বা ইন্দ্রপ্রস্থ পুণ্যক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হোত। পুরাণকিল্লা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে যা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সাক্ষ্য বহন করে। ▯

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে ৈির তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

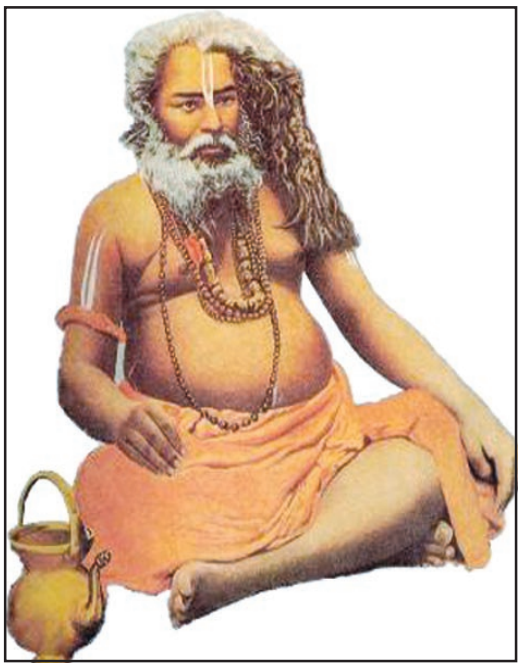

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অগ্রপথিক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

রবীন সেনগুপ্ত

বাংলার রেঁনেসাস-এর যুগের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম ওতপ্রতো ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিজয়কৃষ্ণর বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম হওয়ায় বৈষ্ণব-ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তো ছিলেনই। কেশব সেনেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। কাজেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। জনসমাজে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রভাব প্রস্তাবের নানা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। আবার তিনি যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গেও নিয়মিত দেখা করতেন তার উল্লেখ শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থেই রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ যুক্ত হয়েছিলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে পর্বতের গুহায় বসে, অরণ্যের মাঝে বসে কঠোর যোগ তপস্যার অভিজ্ঞতাও বিজয়কৃষ্ণর ছিল যা অনেক ব্রাহ্ম এবং বৈষ্ণব সাধকদেরই ছিল না।

এমনি ভাবে মাত্র ৫৮ বছরের জীবনকালের মধ্যেই তিনি সঞ্চয় করেছিলেন দুর্লভ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, যা অর্জন করতে সাধারণ সাধকদের শত বৎসর অতিক্রম করতে হয়।

বাংলার ১২৪৮ সনের শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমায় শান্তিপুরের নামকরা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছিল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর। তাঁদের গৃহদেবতার নাম ছিল শ্যামসুন্দর। বিজয়কৃষ্ণ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁর মাতৃদেবী প্রায়শই স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণের দর্শন পেতেন। ছেলেবেলায় দুরন্ত ছিলেন তিনি, কিন্তু পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মেডিক্যাল কলেজেও পড়াশুনা করেছিলেন কিন্তু শেষ অবধি ফাইনাল পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তৎসত্ত্বেও জীবনের নানা সময় বহুজনকে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলেছিলেন গোস্বামীজী। একবার শান্তিপুরে থাকাকালীন চিকিৎসক হিসাবে তাঁর ভীষণ যশ ছড়িয়ে পড়ায় ও অগণিত রোগীর ভীড় হওয়ায় যোগ সাধনার দিব্য জীবনে রীতিমতো বিপর্যয় দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল তাঁর।

অল্প বয়সে গোস্বামীজী শংকরাচার্যের বেদান্ত দর্শন পাঠ করে মায়াবাদী হয়ে ওঠেন। প্রচলিত উপাসনা, পূজা পদ্ধতিতে তাঁর অনাস্থা চলে আসে। মায়াবাদী ধ্যানধারণা নিয়ে বেশ কিছুকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর বিজয়কৃষ্ণ দেখলেন এতে তাঁর জীবনে এবং মননে নানা অশান্তি দেখা দিচ্ছে। এই নিয়ে তিনি নানা সাধুসন্তের সঙ্গে আলোচনা করে শেষে সনাতন পদ্ধতিতেই প্রত্যাবর্তন করলেন।

আবার তিনি ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে এসে সনাতন হিন্দু ধর্মের নানা বিষয়ে অনাস্থা নিয়ে চলতে শুরু করলেন। ১৮৬০ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মই গ্রহণ করে বসলেন এবং উপবীত অর্থাৎ পৈতা ত্যাগ করলেন। এর ফলে নতুন ধরনের আলোড়ন দেখা গেল তাঁর আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে, তাঁর মাতৃদেবী তো খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি তাঁকে পৈতা পুনরায় গ্রহণের জন্য বারবার চাপ প্রদান করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তখনকার মতো ব্রাহ্ম মতেই অটল রইলেন। এতে সমাজপতিরা তাঁকে সমাজে একঘরে করে দিল। ওরই মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ সমাজে ব্রাহ্ম মত প্রচার করে তাঁর অনুগামী তৈরি করে ফেললেন। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে নতুন ব্রাহ্মদলও গঠন করে ফেললেন। ১৮৭০ সালে ঢাকাতে তিনি ব্রাহ্ম মত প্রচার করলেন।

ব্রাহ্ম মত প্রচার করলেও নানা মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হচ্ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। একবার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে নতুন করে অনেক বিষয় উপলব্ধি করলেন তিনি। আরও অধিক মানুষ আকর্ষণের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের কীর্তনের প্রচলন করলেন তিনি।

ঈশ্বরের কৃপায় দু'দুবার অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। একবার পাহাড়ের অরণ্যে যোগধ্যানে মগ্ন ও সমাধিস্থ থাকার সময় দাবানলে দগ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ওঁর। সে যাত্রায় লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁকে রক্ষা করেন। লোকনাথজীর প্রাথমিক সামাজিক যশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ প্রভূত সহায়তা করে কৃতজ্ঞতা জানাতে কসুর করেননি। আর একবার নৌকাডুবির হাত থেকেও বিজয়কৃষ্ণ জোর বেঁচে যান।

কেশব সেনের সঙ্গেও মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় বিজয়জী নতুন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। তারই মাঝে বৈষ্ণব, শৈব, অঘোরপন্থি, নানকপন্থি প্রভৃতি নানা মতবাদের সাধকদের সঙ্গে মার্গ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। তাঁর ৪২ বছর বয়সে ২৯০ বঙ্গাব্দে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কাছে নানা অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করে দীক্ষা গ্রহণ করেন বিজয়কৃষ্ণ। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বৃন্দাবনে গিয়েও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। শেষে বিজয়কৃষ্ণজী এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সনাতন হিন্দুধর্মের সবই সত্য। শাস্ত্র, দেবদেবী, গুরুবাদ, অবতারবাদ কিছুই মিথ্যে বা কুসংস্কার নয়। পরবর্তী জীবনে তাই তিনি হিন্দু মতে দীক্ষা-শিক্ষা দুইই দান করতে থাকেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দে কুম্ভমেলায় গমনের পর পুরীতে যান গোস্বামীজী। সেখানে এক মহান্ত তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে। ১৩০৬-এর ২২ জ্যৈষ্ঠ উনি দেহত্যাগ করলে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

□

(শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ১৭২তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মুদ্রিত)

ছবির প্রদর্শনী

প্রেরণাদের প্রেরণা দিলেন নামী চিত্রকর

নোটিশটা দেখার পর থেকেই প্রেরণা ঠিক করতে পারছিল না কি আঁকবে। যা খুশি আঁকার জন্যে বলা হয়েছে। নিজের মনের মধ্যে যা আসে তা নিয়ে আঁকতে অসুবিধে নেই। কিন্তু একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে ভাবনাগুলো এলেই মুশকিল। জট পাকিয়ে যায়। জট ছাড়ানো কঠিন। অনেক সময় লাগে। সোজাসুজি ভাবলে সুবিধে। আঁকতে গিয়ে দেখে সোজাসুজি সহজ করে যা আঁকবে ভেবেছিল তা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। মনের জানালাগুলো খুলে ধরলে অনেকরকম ছবি দেখা যাবে। একটার পর একটা ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিন্তু তা বেশিক্ষণ থাকে না। চট করে হারিয়ে যায়। নোটিশের কথাগুলো মনে পাক খেতে লাগল। 'ছোটোদের আঁকার প্রদর্শনী এবারেও হবে অন্যান্য বছরের মতো। তিনদিনের প্রদর্শনী। তোমরা চটপট ছবি দাও।' প্রেরণা ভাবতে লাগল কি এঁকে জমা দেবে চন্দন-স্যারকে। ছবি আঁকা শেখায় চন্দন-স্যার। আরও কয়েকজন শেখায়। অনেক কিছু শেখার ব্যবস্থা আছে। সবাই মিলে শেখায় মজা আছে। প্রদর্শনীর ব্যাপারটাও বেশ আনন্দের। হইচই করে ছবি নিয়ে খেলা করা যায়। চন্দন-স্যারের কাছে শুনেছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তিনি বলতেন,'তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই তবে লিখি ছবিটি।' তিনি বলতেন, 'কোন্ ঠাকুর ছবি লেখে? ওবিন ঠাকুর।' চারটে ছবি এঁকে রঙ করে জমা দিল প্রেরণা। ছবি নিলো তুহিনাদি। ছোটোদের গান শেখায়। ছবিও আঁকে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন শুক্রবার। কদিন ধরেই চলছিল সাজোসাজো ব্যাপার। সব কাজ ঠিক সময়ে হয়ে যায়। তবু হইচই না করলে মজাটা যেন কম পড়ে যায়। নামকরা চিত্রকর আর ভাস্কর আসছেন প্রদর্শনীর উদ্বোধনে। প্রেরণারা খুব আনন্দে রয়েছে। তার চারটে ছবিই রয়েছে। বাবা মা এসেছে। খুব ঘরোয়া অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করে নামী ভাস্কর বললেন, 'ছোটোদের ছবির বিচার চলে না। ওরা আপন মনে যা এঁকেছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছবি। মন দিয়ে দেখা চাই। আপনারা ওদের প্রত্যেককে পুরস্কার দিন। না, না আপনাদের টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি টাকা দিচ্ছি। পুরস্কার দিন।' অন্যরকম সাড়া পড়ে গেলো।

প্রেরণা সুন্দর সেজেছে। নিজে নয়। মা সাজিয়ে দিয়েছে। পরীর মতো লাগছিল। ওর মতো আরও অনেকে খুশি মনে ঘুরছিল। নামকরা আঁকিয়েকে চেনেনা প্রেরণারা। তিনি হঠাৎ ধরলেন প্রেরণাকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ছবি কোথায়?' প্রেরণা হাত ধরে বলল, 'চলো দেখিয়ে দিচ্ছি।' চিত্রকর গেলেন। প্রেরণা বলল, 'দ্যাখো, চারটে ছবি।' মন দিয়ে চিত্রকর বললেন, 'তোমার আঁকা ওগুলো?' প্রেরণার একটু রাগ হলো, সে বলল, 'তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না।' প্রেরণা চলে যাচ্ছিল। যাঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তাঁরা একটু ঘাবড়ে গেছেন। প্রেরণার কথায় রেগে গেলেন নাকি বিখ্যাত মানুষটি? সকলে অবাক হয়ে দেখল, প্রেরণাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। তাকে কোলে নিয়ে ঘুরলেন। ডাকতে বললেন প্রেরণার বাবা-মাকে। তাঁদের বললেন, 'খুব ভালো মেয়ে আপনাদের। যত্নে বড়ো করে তুলুন।' প্রেরণা তখন দাদুর কোলে মুচকি মুচকি হাসছে। চারপাশে যেন বাড়তি খুশি ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুরস্কার চলে এলো। সকলে পেলো। প্রেরণা তো বটেই। রঙের বাকসো পেনসিল রবার খাতা চকোলেট। প্রেরণাকে কোল থেকে নামাবার সময় একটা বড়ো চকোলেট দিয়েছিলেন। আরেকটা পেলো সকলের সঙ্গে। প্রেরণা সেদিন অফুরন্ত খুশি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল।

এরপর সে অনেক এঁকেছে। দিনে দিনে বড়ো হয়েছে। স্কুলের পড়ার সঙ্গে ছবি আঁকা চলেছে। বাবা-মা তার কাছে বড়ো বন্ধু। প্রেরণা ভোলেনি সেই দাদুর কথা 'মন দিয়ে সাহসের সঙ্গে সব কাজ করবে।'

কৌশিক গুহ

নিজস্ব তথ্য ভাণ্ডার

অলিম্পিকের তথ্য সাজাতে বললেন জয়ন্ত-স্যার

জয়ন্ত স্যার বললেন সকলকে— '২৭ জুলাই থেকে ১২ অগাস্ট অলিম্পিক হচ্ছে। তোমরা এই কদিন সব খবর রাখো। খবরের কাগজে অনেক ছবি আর লেখা বেরোবে। সেসব ধরে রাখলে লাভ। কিছু কিছু জিনিস কেটে একটা খাতায় আটকে রাখলে তোমার অলিম্পিকের ফাইল তৈরি হয়ে যাবে। চার বছর বাদে আবার যখন অলিম্পিক হবে তখন তোমরা বড়ো হবে। নতুন তথ্য যোগ করলে বেশ মজা লাগবে। আরেকটা খাতাও করে রাখা যায়।' জয়ন্ত স্যার দেখালেন ১৯৭২-এ মিউনিক অলিম্পিক থেকে অনেক তথ্য তাঁর

ভাণ্ডারে। বললেন, 'ওই বছর থেকে আমি সব খবর রাখা অভ্যেস করেছি। আগের ইতিহাস পড়েছি। কিছু বইপত্র জোগাড় করেছি।' জয়ন্ত-স্যার আগেও অনেককে বলেছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ তথ্য সাজিয়েছিল। এ বছর কয়েকজন উদ্যোগ নিয়েছে। স্যার সব দেখিয়ে দেবেন বলেছেন।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. অলিম্পিকের মূল ঘোষণা কি?

২. পঞ্চবলয়ের নকশা কার? রঙ কি কি? কেন পঞ্চবলয়?

৩. কোন্ অলিম্পিকে ইজরায়েল-এর অ্যাথলিটদের হত্যার ঘটনা ঘটে? কজনের মৃত্যু হয়? হত্যাকারী কারা?

৪. কতদিন পর লন্ডনে অলিম্পিক হচ্ছে? আগে কবার হয়েছে? কোন্ কোন্ সালে?

৫. এবছর কটি দেশ অংশ নিচ্ছে? প্রতিযোগী কত?

উত্তর : ১. সিটিয়াস, অলটিয়াস ফোর্টিয়াস— তার মানে আরও জোরে, আরও উঁচুতে, আরও শক্তি নিয়ে। ২. পিয়ের দ্য কুবারতাঁ। হলুদ সবুজ লাল কালো নীল। পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক। ৩. মিউনিক। ১১ জন। প্যালেস্টাইন জঙ্গিরা। ৪. ৬৪ বছর। ১৯০৮। ১৯৪৮। ৫. ২০৪টি দেশ। ১০,০০০ প্রতিযোগী।

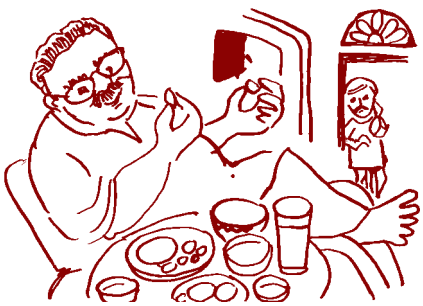

ছোটোদের বলছি

উ ল টো পা ল টা

অনেক রাত পর্যন্ত গান শোনেন, পড়েন। তাই সকালে উঠতে দেরি হয়। জলখাবার নিয়ে আসে জগদীশ পাড়ার দোকান থেকে। কচুরি রসগোল্লা সন্দেশ। দিনে দিনে মেদের পাহাড় হচ্ছে শরীর। একটু অসুবিধে দেখা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। ডাক্তার এসে বললেন, 'মিষ্টি ছাড়তে হবে'। কর্তা বললেন, 'মিষ্টি ছাড়বো কি করে! তুমি কমাতে বলতে পারো।' ডাক্তার বললেন, 'দুটো রসগোল্লা দুটো সন্দেশ খাবেন।' একমাস বাদে ডাক্তার দেখলেন কোনও উন্নতি হয়নি। বললেন, 'মিষ্টি কটা খাচ্ছেন? কর্তা জানালেন 'তোমার হুকুম মতো দুটো করে।'

ডাক্তার বললেন, 'রসগোল্লা বাদ দিন। সন্দেশ একটা করে।' পরের মাসেও ডাক্তার অবাক। রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়েছে। জিজ্ঞেস করলেন 'মিষ্টি কটা খাচ্ছেন?' কর্তা বললেন, 'তোমার কথামতো একটাই।' ডাক্তার কর্তার ছেলেদের ডাকলেন কর্তার আড়ালে, 'দোকানে খোঁজ নিন তো।' ছেলেরা গিয়ে জানতে চাইল, 'মিষ্টি যায়?' দোকানদার বলল, 'যায়।' এবার প্রশ্ন, 'কটা?' উত্তর 'একটাই।' পরের প্রশ্ন, 'কতবড় আকারে?' এবারের উত্তর, 'তা একটু বড়োই।' আবার প্রশ্ন, 'কতটা বড়ো?' মিঠাইওলার উত্তর, 'দশটা পাঁচটাকার সন্দেশ মিলিয়ে বানানো একটাই। কর্তাবাবু বলেছেন আমাকে একটা মিষ্টি খেতে বলেছে ডাক্তার। কতটা বড় হবে মিষ্টিটা তা যখন বলেনি তখন বড় করেই একটা বানিয়ে পাঠাস।'

রামগরুড় সংকলিত

ঘরোয়া শিল্পী মেয়েদের কথা

প্রীতি বসু

আজকের বিশ্বায়নের নিদারুণ চাহিদার যুগে পুরুষদের আয়ে যেন কিছুতেই সংসারের চাহিদা পূরণ হয় না। পোষাকী কথা অবশ্য নিদারুণ বেকার সমস্যা সংসারগুলিকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম করে তুলেছে। আমি বেকার সমস্যার কথাটি বাদ দিচ্ছি না। তবে বাস্তুশাস্ত্রে দেখা যায় নিদারুণ চাহিদার কথা যে বলেছি সেটিও মিথ্যা নয়। যাই হোক, উপরোক্ত সমস্যার উপর প্রলেপ দিতে এগিয়ে এসেছেন— দক্ষিণ ২৪ পরগণার কয়েকজন স্বল্পশিক্ষিত মহিলা।

প্রথমেই বলি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৃৎশিল্পী অশীতিপর পারুলবালার কথা। তাঁর বাড়িতে ঢুকেই দেখলাম মাটির বাড়ির উঠোনে বসে এক বৃদ্ধা হাঁড়ি-কলসী তৈরি করছেন। এগিয়ে গিয়ে বললাম— একটু আলাপ করতে এলাম। একরকম চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধাটি হাসিমুখে একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিলেন। দন্তহীন মুখে হাসি ফুটিয়ে সলজ্জভাবে বললেন— 'পারুলবালা'। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম— কত বছর ধরে একাজ করছেন? উত্তর দিলেন— আমরা যে জাত কুমোর। বাপের বাড়িতেও ছোটবেলায় একাজ শিখেছি— করেছি, তারপর শ্বশুরবাড়িতে আসা অবধিই তো করে চলেছি।

ইতিমধ্যেই সেখানে জমায়েত হয়েছে তাঁর বৌমারা ও পাড়া প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলা। তাঁদের নাম— সন্ধ্যা, জবা, শঙ্করী, বৃহস্পতি প্রভৃতি।

বললাম মাটির কাজ তো সাধারণত পুরুষরাই করেন। বৌমা সন্ধ্যা বললেন— 'নানা মাটির কাজ চিরকালই মেয়েরাই করে। তবে সংস্কার আছে— মাটি পোড়ানোর ব্যাপারটা পুরুষদের দিয়ে করাতে হবে। তাই সেটি আমরা পুরুষদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে মাটির সকল রকম কাজই আমরা করি।' প্রতিবেশী মহিলারাও তাতে সায় দিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম— ঘর সংসারের কাজ সেরে তোমরা কতটা কাজ করতে পারো? উত্তর পেলাম— সংসারের কাজ সেরে তাঁরা দিনে একমণ থেকে সোয়ামণ মাটির কাজ করতে পারেন। আর তাঁরা যদি সারাদিনই মাটির কাজ করেন তাহলে তাঁরা দু'মণ থেকে তিন মণের মতো কাজ করতে পারেন।

জিজ্ঞেস করলাম— একাজ করে যা আয় হয় তা দিয়ে তোমরা কি কর?

তাঁরা হেসে ফেলে উত্তর করলেন— পুরুষদের আয়ে সংসারটাই কোনও মতে চলে। সখ শৌখিনতাও তো আছে। আমরা আমাদের মাটির কাজের আয়ে সেগুলোকে পূরণ করি।

তাঁদের মধ্যে থেকে অল্পবয়সী এক বিধবা মহিলা বললেন— স্বামী অল্প বয়সেই চলে গেলেন। আমি তো দুটি মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে অথৈ সাগরে পড়লাম। তারপর এই মাটির কাজ ধরেই তো সংসারটাকে খাড়া রেখেছি।

এবার বলি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিবিরহাট অঞ্চলের কয়েকজন মহিলা জরি-শিল্পীর কথা। এদের নাম— ফতেমা খাতুন, রিবিকা, জারিনা

বেগম প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গে হিন্দু রেখা, কমলা, বেবীরাও আছেন।

তাঁরা জানালেন— তাঁরা স্থানীয় একটি জরির কাজের কারখানাতে কাজ করেন। প্রত্যহ মোটামুটি তাঁদের সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। রবিবারে সবেতন ছুটি।

কারখানাটিতে কিসে কিসে কাজ করা হয় জানতে চাইলে তাঁরা জানালেন— প্রধানত শাড়ীতেই কাজ করা হয়। তবে সালোয়ার-কামিজ, ওড়না ও অন্য কোনকিছুতে কাজ করার বিশেষ অর্ডার থাকলে করা হয়।

এক একটা শাড়ী করতে ক'দিন লাগে এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন— হাল্কা কাজ থাকলে একদিনেই করে ফেলা যায়, তবে ভারিত্বের পরিমাণ অনুযায়ী চার-পাঁচ দিনও লাগে।

দামের কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানালেন— হাল্কা ও ভারিত্বের উপর দাম নির্ভর করে। তারমধ্যেই একজন একটু হালকা স্বরে জানালেন— আমাদের আয় দামের উপর নির্ভর করে না। কারখানার মালিক বেশি অর্ডার, কম অর্ডার যাই পান, আমাদের রোজ হিসেবেই টাকা দেন। সবদিন যে আমাদের কাজ হয় তাও না। কতদিন এসে কাজ না পেয়ে ফিরে যেতে হয়।

তবে তোমরা এ-কাজ কর কেন?

বেবী বলল--- বাবা-মা সবাই চলে গিয়েছেন। আমরা তিন বোন। দিদির আর আমার বিয়ে হয়নি। মেজ বোনের বিয়ে হয়েছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে তারই সংসার, বাড়িটা অবশ্য পৈতৃক। জামাইবাবু রঙমিস্ত্রী। তাঁর আয়েই মেজদি আমাদের সকলকে নিয়ে সংসার চালায়। কিন্তু অভাব-অনটন, বোনপো-বোনঝিদের সখ-আহ্লাদ যদি কিছু পূরণ করতে পারি, আর ঘরে বসেই জরির কাজ তো পাশের বাড়ির বৌদি ফতেমার কাছে শিখেছি, তাই তার সঙ্গেই কারখানাতে যাই, যেদিন কাজ পাই করি, না পেলে শুধু হাতেই বাড়ি ফিরি।

ফতেমা খাতুন বেশ বর্ষীয়সী মুসলমান বধূ। কথা বলে জানলাম তিনি জারির কাজে বেশ পটু। সেদিন কারখানার কাজ থাকে না, সেদিন নিজের ঘরেতেই আগে থেকে অর্ডার নেওয়া যে কাজগুলো থাকে সেগুলোই ঘরে ফিরে এসে করেন।

জিজ্ঞেস করলাম— তোমার স্বামী কি করেন?

উত্তর করলো— মিশনারী স্কুলের বাসের ড্রাইভার। তাঁর আয়েই সংসার চলছিল। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, খরচও বেড়েছে। তাই সংসারটাকে সামলিয়েই জরির কাজ করে কিছু আয়ের চেষ্টা করি। যদি ছেলে-মেয়েদের সাধ-আহ্লাদ কিছুটা পুরণ করতে পারি।

কলকাতার লাগোয়া ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে অনেক টিপ কারখানা গড়ে উঠেছে। সোয়েটার বা অন্যকোনও জিনিস দিয়ে তৈরি রেডিমেড নানান রঙের টিপ তো এখন মেয়ে-বৌ-দের দৈনন্দিন ব্যবহার্য একটা প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে উঠেছে। তাই টিপ কারখানাও গড়ে উঠছে। আর তাতে রীনা, লীলা, অঞ্জলির মতো স্বল্প শিক্ষিত মেয়ে-বৌ-রাও টিপ তৈরি, সেগুলিকে প্যাকেটে ভরা, পিন দিয়ে আটকানো প্রভৃতি করতে কিছু আয় করে সংসারের কিছু সুরাহাও করছে, আবার নিজেদের শখও কিছু কিছু মেটাচ্ছে। □

প্রথম শহীদ কে?

দীনেশ চন্দ্র সিংহ

বাংলার স্বদেশী বা বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে কোনজনকে প্রথম শহীদের সম্মান দান করা যায়, সে নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতান্তর রয়েছে।

আলিপুর বোমা মামলার বাংলার বিচারপতি মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় জড়িত দু'জন বিপ্লবীর একজন ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে অমর হয়ে রইলেন : আরেকজন প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নির্যাতন ও স্বীকারোক্তি এড়াতে নিজ রিভলবাবের গুলিতে আত্মঘাতী হলেন। প্রফুল্ল মারা গেলেন ২ মে, ১৯০৮; আর ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হলো ১১ আগস্ট, ১৯০৮। সুতরাং শহিদত্ব বরণে প্রফুল্ল চাকী যে 'সিনিয়র' এবং স্বদেশী আন্দোলনে প্রথম শহীদ সেকথা মানতেই হয়।

প্রফুল্ল ছিলেন রংপুর (অধুনা বাংলাদেশভুক্ত) জেলার স্কুলের ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে জারি হয়েছিল কুখ্যাত 'কার্লাইল সার্কুলার'। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিভিন্ন স্কুল কলেজে গড়ে উঠেছিল 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'। রংপুর জেলা স্কুলের কয়েকজন ছাত্র এই সার্কুলারবলে দণ্ডিত হয় ও বিতাড়িত হয়। প্রফুল্ল চাকী ছিলেন তাদের অন্যতম।

আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার ও হিংস্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন নয়াসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশের ছোটলাট ব্যামাফিল্ড ফুলার। এই দুর্বিনীত ফুলারকে কিভাবে মাথা নত করে এদেশ ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল, সে কাহিনীও চমকপ্রদ।

স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণে সর্বপ্রথম অপরাধী সাব্যস্ত হয় পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের বনওয়ারীলাল হাইস্কুল এবং ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল। ওই দুটি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। শাস্তিস্বরূপ স্কুল দুটির অনুমোদন বাতিলের জন্য ফুলার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সুপারিশ করেন। এই দুটি স্কুলের ব্যাপারে জল অনেক দূর গড়িয়েছিল এবং তাতে ছোট লাট, বড় লাট, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে বিলাতে ভারত সচিব পর্যন্ত জড়িয়েছিলেন।

স্যার আশুতোষ মাত্র চার মাস আগে উপাচার্য পদে যোগদান করেছেন। তিনি ফুলারের চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে সিন্ডিকেটকে দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে যখন নতুন রেগুলেশন প্রস্তুত ও প্রয়োগ হবে, সে পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঝুলিয়ে রাখলেন। আশুতোষ দেখলেন স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ববঙ্গ উত্তেজনায় টগবগ করছে। এই অবস্থায় ছোটলাট ফুলারের আবদার রক্ষা করতে গেলে আগুনে ঘতাহুতি দেওয়া হবে মাত্র। অথচ ফুলারের আর তর সইছে না। তিনি স্কুল দুটির অনুমোদন বাতিলের জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। আশুতোষ তখন ফুলারের জেদের পরিণতি কি হতে পারে তা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লর্ড মিন্টোকে লিখলেন :

"Let me point out to your Excellency that if the Lieutenant Governor insists on taking action by the University, the result will be acrimonious public discussion in the Senate and outside... The administration will be bitterly attacked. I, therefore, think it most desirable to avoid such a contingency."

লর্ড মিন্টো আশুতোষের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন এবং ফুলারকে স্কুল দুটির অনুমোদন বাতিলের আর্জি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। আচার্যের অনুরোধ সত্ত্বেও ফুলার তার জেদ ত্যাগ করলেন না। তিনি লর্ড মিন্টোকে সোজাসুজি লিখে পাঠালেন— হয় স্কুলের অনুমোদন বাতিল করতে হবে, নতুবা তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে হবে।

লর্ড মিন্টো তখন আশুতোষের কাছে লিখলেন— ''সিন্ডিকেট বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারে কিনা। উত্তরে আশুতোষ জানালেন— 'ইহা অসম্ভব'। সমগ্র বিষয়টি তখন বিলাতে ভারত সচিব লর্ড মর্লের সমীপে পেশ করা হলো। তিনি আচার্য এবং উপাচার্যের অভিমতই বহাল রাখলেন এবং ফুলারের পদত্যাগপত্র গৃহীত হলো। পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও যুবকশ্রেণী ফুলারের সন্ত্রাসী শাসন থেকে মুক্তি পেল।

ট্রেনের লাইনে প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় মিঃ ফুলারের দৈহিক মৃত্যু না ঘটলেও তারই প্রতিক্রিয়ায় যে ফুলারের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মোকামা স্টেশনে যে পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী প্রফুল্লর অপঘাতে মৃত্যুর কারণ, বিপ্লবীরা তাকেও রেহাই দেয়নি। প্রফুল্ল'র মৃত্যুর ছ'মাসের মধ্যে ১৯০৮-এর অক্টোবর মাসে কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করে প্রফুল্লর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন বিপ্লবীরা। □

বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা

অতিথি কলম

ডঃ বি কে মুখোপাধ্যায়

বিত্তশালী দেশগুলির মধ্যে একটা চালু কথাই হলো ওয়াশিংটন হাঁচলে টোকিওর সর্দি হবে। এখন মনে হয় বিশ্বায়নের দুনিয়ায় কথাটা কি আরও পাঁচটা দেশের সঙ্গে দিল্লী, ঢাকা বা কলম্বোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। এমনটা না হলেই মঙ্গল তবে অর্থনীতির চলতি চলন-বলন কিন্তু অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিতই দিচ্ছে। তাই সারা বিশ্বের দেশগুলির মধ্যেই আপস সহযোগিতার ভিত্তিতে সামগ্রিক ব্যবস্থা না নিলে সকলকেই কমবেশি ফল ভোগ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার ফেডারেল অর্থনীতির এক ভূতপূর্ব কর্তা এল্যান গ্রিনস প্যান হা-হুতাশ করে বলেছেন, চার বছর আগেকার সাব প্রাইস ক্রাইসিস (একই ঋণদাতার ঋণশোধ

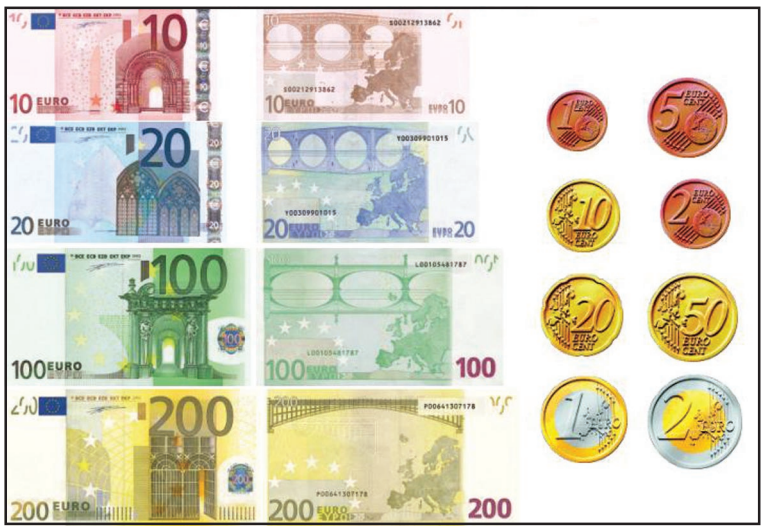

> "সমগ্র ইউরোপে একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা 'ইউরো' চালু হওয়ার পর ইউরো ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সব সদস্য দেশগুলিই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। যে জন্য আজ যখন গ্রীসের অর্থনীতি ধ্বংসোন্মুখ বা স্পেনের অর্থব্যবস্থা বিপদের দোরগোড়ায় তখন বিপদ সঙ্কেত সকলেরই। তাই ইউরো থেকে গ্রীস বেরিয়ে যাবে কিনা সেটা না যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে ঢের জরুরি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কৌশল নেওয়ার।"

দেখলে মনে হয় সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

বিপুলাকার অর্থ ব্যবস্থাগুলির অনেকেই ডুবন্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও কি অতলান্ত গহ্বরের দিকে চলেছি? হয়তো যতটা আশঙ্কা করা হচ্ছে ততটা না হলেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী করার প্রতিশ্রুতিপত্র বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে হাত পাল্টে যাওয়া ও যথাযথ সম্পত্তির মূল্যায়ন ও ঋণগ্রহীতার ঋণ শোধের যোগ্যতা না দেখেই ঋণ দেওয়া অর্থাৎ প্রাইম লেন্ডিং রেটেরও নীচে সুদ নেওয়া যাতে আদতে ব্যাঙ্কগুলি ধংসের মুখে পড়ে)-এর পুনরাবৃত্তি যে ঘনিয়ে আসছে তা টের পাওয়ার পরও কোনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়াই আমেরিকান অর্থনীতির পিছিয়ে পড়ার কারণ।

তাই এখন কিন্তু সময় এসেছে প্রকৃত পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখে আরও গুরুত্ব দিয়ে কাজে হাত লাগানোর। সমগ্র ইউরোপে একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা 'ইউরো' চালু হওয়ার পর ইউরো ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সব সদস্য দেশগুলিই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। যে জন্য আজ যখন গ্রীসের অর্থনীতি ধ্বংসোন্মুখ বা স্পেনের অর্থব্যবস্থা বিপদের দোরগোড়ায় তখন বিপদ সঙ্কেত সকলেরই। তাই ইউরো থেকে গ্রীস বেরিয়ে যাবে কিনা সেটা না যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে ঢের জরুরি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কৌশল নেওয়ার। যদি ইউরোই না থাকে, ইউরোপের কি থাকবে? স্পেন ও গ্রীসের এই বিপদাপন্ন অর্থনৈতিক অবস্থায় ইউরোপকেই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে রাস্তা বাতলাতে হবে, তারা অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকা দেশগুলির ক্ষেত্রে ইউরোকে আগামী দশকেও টিকিয়ে রাখতে কী করতে চায়।

ইতিমধ্যেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান স্পেনকে তার ধুঁকতে থাকা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার ব্যাপারে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছে। স্পেনের ব্যাঙ্কগুলির এই টালমাটাল অবস্থার ধাক্কা লেগেছে শেয়ার বাজারে ও ঋণের সুদ আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। তারা আরও জানতে চেয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত প্রধান স্পেনীয় ব্যাঙ্কটিকে বাঁচাতে সে দেশের সরকার মূলধন সরবরাহের কী ব্যবস্থা নিয়েছে। একইরকম অবস্থায় আরও কোনও ব্যাঙ্ক রয়ে গেছে কিনা যারা রিয়েল এস্টেটে লগ্নি করে পথে বসতে চলেছে। যদি সেরকম সম্ভাবনা থাকে তাদেরও মূলধনী সাহায্য দেওয়া হবে কিনা? এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য খবরাখবর না আসায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মহল আশঙ্কা করছে মন্দাক্রান্ত স্পেনের অবস্থাও হয়ত গ্রীস, পর্তুগাল বা আয়ারল্যান্ডের মতোই হতে চলেছে। যখন স্পেন নিজেই ইউরোজোনের কর্তাদের কাছে হাত পাতবে।

আমেরিকার অবস্থাও তথৈবচ। তাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় (fedral budget) হিসেব-নিকেশ

যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তার সফল মোকাবিলা না হলেই অর্থনীতির আকাশ কালো হয়ে আসবে। দেশের রাজস্ব ঘাটতির সমস্যাকে বাগে আনতে গেলে সেখানেও গ্রীসের বা ফ্রান্স বা রোমের অনুসরণে বেতন হ্রাস, সরকারি খরচ কমানোর মতো আপাত জনপ্রিয়তাহীন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে ফেডারেল রিজার্ভের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বেন বার্নেক রাখঢাক না করেই বলেছেন, হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেস সময়োচিত ব্যবস্থা না নিলে রাজস্ব সংক্রান্ত এই ঘনিয়ে ওঠা বিপদ অচিরেই আমেরিকান অর্থনীতিকে আগামী অর্থবর্ষেই দ্বিগুণ মন্দার মুখে দাঁড় করাবে।

এখন একবার তেলের বাজারের দিকে নজর দিতে হয়। ইউরোপীয় দেশসমূহের দেনার ভার ও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তেলের ক্রেতা আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান চাহিদা হ্রাসের ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম নেমে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিঃসন্দেহে বিপুল ভাবে পড়ে গেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে স্পেনের ব্যাঙ্কগুলির ঋণগ্রহীতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। সেখানকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়ার মুখে। এই যুগপৎ ধাক্কা এসে লেগেছে বিশ্বের শেয়ার বাজারগুলিতে। সেগুলিও মন্দার গ্রাসে। ইউরো মুদ্রার ক্রমিক পতনে ইউরোজোনের অন্তর্গত দেশগুলিকে এখন তেলের দাম ডলারে মেটাতে হচ্ছে। ফলে বাস্তবে দাম ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এই সামগ্রিক পটভূমিতেই ইউরোপের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইউরোজোনের অস্তিত্ব টিকে থাকা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আপতকালীন ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নিলে ইউরোপীয় মুদ্রা ব্যবস্থাসহ ইউরোজোন বিলুপ্তির রাস্তায় এসে দাঁড়াবে। স্পেনের অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস ও গ্রীসের ইউরো মুদ্রা ব্যবস্থা থেকে সম্ভাব্য বিদায়কে মাথায় রেখে পরবর্তী দশকে ইউরোকে সচল রাখার উপরে ইউরোপকে রাতারাতি রাস্তা বাতলাতে হবে।

গত মাসে আমদানীর পরিমাণে ব্যাপক হ্রাস ঘটায় একদিকে ভারত কিছুটা সুরাহা পেয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতি গত সাত মাসের মধ্যে সব থেকে নীচে এসে ১৩.২ বিলিয়ন ডলারে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য চলতি রাজস্ব বর্ষের প্রথম মাসে আমদানী ৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বাণিজ্য ঘাটতি কম হওয়ায় টাকার তীব্র অবমূল্যায়নজনিত (ডলারের বিনিময়ে বেশি টাকা দেওয়ার) হাত থেকে দেশ কিছুটা নিষ্কৃতি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর থেকে ডলার সাপেক্ষে টাকার দাম প্রায় ১৫ শতাংশ নেমে গেছে। গত সপ্তাহে তা ৫৫.৮৫ পয়সার আশপাশে ছিল। অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক চাহিদা হ্রাসকে সামাল দিতে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের কোম্পানীগুলি ইতিমধ্যেই ব্যয় সঙ্কোচের রাস্তা ধরেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, করণীয় কী? যখন এটা বেশ পরিষ্কার যে এই অর্থবর্ষে পরিস্থিতির ভাল হওয়ার সম্ভবনা তো নেই-ই বরং আরও খারাপের দিকেও যেতে পারে।

প্রশ্নটির একমাত্র উত্তর হচ্ছে— একই সঙ্গে গ্রাম ও নগর উন্নয়নের প্রকল্পগুলির কাজে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া। উন্নতিশীল দেশগুলির ভবিষ্যৎ যে শিল্পোন্নয়নের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। আর এর কোনও শর্টকাট তো নয়ই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি ধরে নেওয়া যায় যে মফস্বল অঞ্চলে দারিদ্র্য খুবই কম? উত্তর— মোটেই না। মফস্বলের উন্নয়ন না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। সেই কারণেই গ্রাম-মফস্বলের যুগপৎ উন্নয়নই একান্ত জরুরি। সম্পদের এই গ্রাম-শহর দ্বিমুখী স্রোত না থাকলে সাইকেলের একটা চাকা থাকার মতো অবস্থা হয়ে যাবে। একই সঙ্গে কৃষি খামার ক্ষেত ও অন্যক্ষেত্রের উন্নয়নে হাত দিলে তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রযুক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এই বিষয়ে শহর সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ দেখভাল করার সংস্থা অবশ্যই রয়েছে। এই সংস্থা সব সময়ই স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে থাকে। ভবিষ্যৎ উন্নতির একটি সামগ্রিক রূপরেখা তৈরী করাও তাদের কাজ। এই সংস্থার Metropolitan Planning Organisation-এর মাধ্যমেই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যে বিভিন্ন প্রকল্প সংঘটিত হয় তার যাবতীয় খরচাপাতি ও টাকা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাটিকে ইংরেজীতে 3c process বলে অভিহিত করা হচ্ছে, যেমন কন্টিনিউয়াস (ধারাবাহিক), কো-অপারেটিভ (সমবায়িক) ও কমপ্রিহেনসিভ (সম্পূর্ণ)। এর কারণ হলো— (১) ধারাবাহিক সবসময়ের জন্যই এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা জারি থাকবে এবং তা কোনওক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী কাজ শেষ করবে আবার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির জন্য প্রস্তুতি নেবে, (২) সমবায়িক অঞ্চলের নাগরিকবৃন্দকে উৎসাহী অংশীদার করে, নানান ক্ষেত্রের মানুষজনকে সামিল করে প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণ জরুরি, (৩) সম্পূর্ণ এলাকার উন্নয়নের কাজে নির্দিষ্ট প্রদেশের ও বিশেষ অঞ্চলের জমির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে।

এমন একটি ১০ বছর মেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল গ্রহণ করলে তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে— (১) পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ (২) অর্থনৈতিক পুর্নগঠন (৩) দীর্ঘমেয়াদ পর্যন্ত ধরে রাখার মতো উন্নয়ন।

দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও চাহিদার বৃদ্ধিই আজ সব দেশের মূল মন্ত্র হতে চলেছে। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী মন্দা সে দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্য ঘাটতির সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন যেহেতু এখন এশিয়াই বিশ্বের সর্বাধিক রপ্তানীকারক মহাদেশ, তাই ইউরোপের দেশগুলি তাদের আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদ (Protectionism) প্রয়োগ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ রপ্তানী কমিয়ে দেওয়া। সারা বিশ্বব্যাপী উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান সরকারি ঋণের প্রেক্ষিতে সকলেই অর্থনীতির পুনর্গঠন শুরু করেছে। আমরা পিছিয়ে থাকলে ঠকে যেতে হবে।

(লেখক একজন স্বনামধন্য ম্যানেজমেন্ট অর্থনীতিবিদ। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

সত্রের জমি বাংলাদেশীদের হাতে

এক অশুভ সংকেত

বাসুদেব পাল॥ 'সত্রের জমি দখল : একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন'— নামে বাংলাদেশীদের অবৈধভাবে অসমের বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় সত্রের জমি জবরদখলের বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ১৩ জুলাই গুয়াহাটিতে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে তদন্ত- প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন তদন্তকারী দলের প্রমুখ এবং অসম রাজ্য সংগ্রহশালার প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ রবীনদেব চৌধুরী। পরাগজ্যোতিতে ভারতীয় পারম্পরিক শিল্প কেন্দ্রে এই সাংবাদিক সম্মেলন হয়।

অসমের প্রায় প্রতিটি সত্রই জবরদখলকারীদের খপ্পরে পড়েছে। সত্রের মতো ধর্মীয় স্থান অবৈধ বাংলাদেশীদের সহজ শিকার। তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে অসমে মোট সত্রের (বৈষ্ণবীয় উপাসনাস্থল) সংখ্যা ৯১০টি। ইতিমধ্যে ২৬টি সত্রের ৫৫৪৮ বিঘা জমি বাংলাদেশী জবরদখলকারীদের খপ্পরে (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমান) চলে গেছে। যে সব সত্রের বেশিরভাগ জমি ওই ৫৫৪৮ বিঘার মধ্যে আছে (৯০ ভাগ) তাদের নাম— কোবাইকাতা সত্র, বরদুয়া সত্র, রামপুর সত্র, পাটেকাবাড়ি সত্র, বালি সত্র। এইসব সত্রগুলি রয়েছে মরিগাঁও জেলায়। সত্রগুলির জমি বাংলাদেশীরা দখল করে ঘাঁটি গেড়ে পাকাপোক্তভাবে জাঁকিয়ে বসেছে।

বর্তমানে কোবাইকাতা সত্রের দখলে রয়েছে মাত্র এক বিঘার মতো। বরপেটা জেলার জানিয়া সত্রের শতকরা নব্বই ভাগ এলাকাই অবৈধ বাংলাদেশীদের দখলে চলে গেছে। বরপেটা জেলার অন্যান্য সত্রও জবরদখলের শিকার। ধুবড়ি জেলার রামরাইকুঠি সত্রের এগারো বিঘা জমি বাংলাদেশীদের দখলে জলে গিয়েছে। সিমালাবাড়ি সত্রের ১৯৫ বিঘা জমি বাংলাদেশীরা দখল করে নিয়েছে। বরপেটা সত্রের ৪৬০ বিঘা জমি দখল করেছে অবৈধভাবে অসমে ঢুকে পড়া বাংলাদেশীরা।

আরও বিভিন্ন সত্র ও হাতছাড়া হওয়া জমির পরিমাণ—

সত্রের নাম	জবরদখলীকৃত জমির পরিমাণ	জেলার নাম
বরদুয়া সত্র	২৮৩ বিঘা	নওগাঁ
বালিসত্র	৪৬২ বিঘা	নওগাঁ
রামপুর সত্র	৫৮৪ বিঘা	মরিগাঁও
আদি এলেনগি সত্র	১,৯০০ বিঘা	লখিমপুর
বাপুপাড়া সত্র	১১০ বিঘা	গোয়ালপাড়া
বিষ্ণুপুর সত্র	১৬১ বিঘা	গোয়ালপাড়া

রাজ্যে বৈষ্ণবীয় নাম ও ভক্তি প্রচারে সত্রগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সত্রগুলো মূলত 'মঠ' গোত্রের। নতুন করে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারই মুখ্য। এছাড়াও অসমে শিক্ষা, যাবতীয় শিল্পকলা এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের শিক্ষা প্রদান করাও সত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড হিস্টরি কংগ্রেস-এর চেয়ারম্যান এবং জাতীয় যাদুঘর-এর প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ রবীনদেব চৌধুরী বলেছেন, সত্রের জমি জবরদখলের ফলে অসমীয়া সমাজভুক্ত মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভেঙে পড়ার অবস্থায় এসেছে। এভাবে চলতে থাকলে অসমীয়া সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। বরপেটা সত্রের প্রমুখ বশিষ্ঠ দেবশর্মা বলেছেন, 'অসমের বর্তমান প্রজন্ম এই জবরদখল বিষয়ে সচেতন নয়। বিশ্লেষকদের মতে এই জবরদখলের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অসমের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পড়ছে— যা এক অশুভ সংকেত। ▯

বইয়ের এজেন্ট চাই

নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ ও ডিগ্রি কোর্সের বই বিক্রয়ের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ভিত্তিক এজেন্সি দিতে চাই।

সম্পূর্ণ পোষ্টাল ঠিকানা দিয়ে এস.এম.এস করুন ৯৮৩২০৪৩৫১৫ নম্বরে।

বই - এস.রায় সম্পাদিত "লেটার মার্ক A+"

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

আলোকোজ্জ্বল গুজরাট

তারক সাহা

নরেন্দ্র মোদীর 'ভাইব্রেন্ট গুজরাট' যে নিছক স্লোগান নয়, সত্যিই আলোকোজ্জ্বল, তা প্রকাশিত কয়েকটি তথ্যে উঠে এসেছে। ভারতীয় তৈলবীজ উৎপাদক রপ্তানি উদ্যোগের হিসেব অনুসারে এই অর্থবর্ষে (২০১২-১৩) গুজরাটে চীনাবাদামের উৎপাদনের ধার্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টন, যা গত অর্থবর্ষের উৎপাদনের ৫৬ শতাংশ অধিক। গত অর্থবর্ষে-এর উৎপাদন ছিল ২ লক্ষ ৯৪ হাজার মেট্রিক টন। গুজরাটস্থিত দুগ্ধ উৎপাদন সংস্থাগুলি দৈনিক ভিত্তিতে দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতার মতো বড় শহরে রপ্তানি করে যথাক্রমে ২০ লক্ষ, ৮ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ লিটার। এছাড়াও দেশের সামরিক বিভাগে দৈনিক ভিত্তিতে দুধ পাঠায় এই রাজ্য।

রাজ্যের সেচ প্রকল্প নেটওয়ার্কে গুজরাট সারা দুনিয়ায় সর্ববৃহৎ। নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর প্রোজেক্টের উচ্চতা ১২১.৯ মিটার। গত এক দশকে গুজরাট কৃষি উৎপাদনে এক বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। ভৌগোলিক আয়তন ১৯.৮ মিলিয়ন হেক্টর অথচ রাজ্যের এই আয়তনে অর্ধেকের বেশি জমিতে অর্থাৎ ৯.৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষি উৎপাদনে। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও গুজরাটে কৃষি বৃদ্ধির হার ১১ শতাংশ, যখন দেশের জাতীয় গড় মাত্র আড়াই শতাংশ।

এই দুই অঙ্কে কৃষি বৃদ্ধির হার প্রমাণ করে যে, সেখানে আবার 'সবুজ বিপ্লব' ঘটে গিয়েছে। গুজরাট দুগ্ধ প্রকল্পে 'অপারেশন ফ্লাড' নামে দুগ্ধ বিপ্লব ঘটিয়েছে। গত দশ বছরে ৬৮ শতাংশ দুগ্ধ ও তার অনুসারী শিল্প বৃদ্ধি হয়েছে। স্পষ্টতঃ সমবায় সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতিদিন দুগ্ধ উৎপাদন বেড়েছে ৪৬ লক্ষ লিটার থেকে ১০০ লক্ষ লিটারে। যার আর্থিক মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০০ কোটি থেকে ১২,২৫০ কোটি টাকায়। এই বৃদ্ধির হার গত দশ বছরে।

দুগ্ধ প্রকল্প থেকে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। সমাজে অর্ধেক জনসংখ্যা যে মহিলা তা গুজরাট প্রমাণ করেছে দুগ্ধ প্রকল্পে তাঁদের অংশীদারিত্ব দিয়ে। বর্তমানে ২২৫০টি দুগ্ধ প্রকল্প চালায় মহিলারা। সেচ পরিকল্পনাতেও গুজরাট ইতিহাস রচনা করেছে জল সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে। দুগ্ধে বিপ্লব আনার পর জল সংরক্ষণেও বিপ্লব এনেছে রাজ্য 'ব্লু রিভলিউশনের' মাধ্যমে। সর্দার সরোবর প্রকল্প সেচ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, পানীয় জলের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে নরেন্দ্র মোদী-র সরকার।

কিন্তু এই সাফল্য রাতারাতি আসেনি। সরকার ও জনতার নিষ্ঠা, উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, কঠোর শ্রম, রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে কৃষিতে উন্নতি, আজ দেশসহ দুনিয়ার গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং বিবিধ সংস্থাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে রাজ্য।

কৃষি বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়েছে ২০০২-২০০৩ সালে যখন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিল্প ও খেত-খামারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। বিদ্যুৎ চুরির সমস্যা সত্ত্বেও খেতগুলিতে রাতে চার ঘণ্টা অনিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এইভাবে ডিজেল চালিত পাম্পের খরচ বাঁচবে।

কৃষি সমাজকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সরকার প্রতি বছর কৃষি মেলার আয়োজন করে থাকে।

জুন মাসের গোড়ায় জুনাগড় জেলার মানবদায়ে এক কৃষি মহোৎসবের আয়োজন করেন নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এই মহোৎসবের সঙ্গে রাজ্যজুড়ে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য মেলাও শুরু হয়েছে। 'কৃষি-রথ' রাজ্যের ২২৪টি মহকুমা পঞ্চায়েত ভ্রমণ করবে।

মোদী-র মতে, কৃষি উন্নয়নের পথে প্রাথমিক বাধা হলো জলের অভাব। কিন্তু জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সারাদেশে গুজরাট এক দৃষ্টান্ত। 'প্রতি বিন্দু জল আরও শস্যের জন্য' স্লোগান-ই কৃষকদের সমৃদ্ধ ও বৈভবশালী করবে।

সারাদেশে প্রথম গুজরাট 'জমির স্বাস্থ্য কার্ড' ইস্যু করছে চাষীদের। কৃষকরা যে জমিতে এক-বা দুটি ফলন করত এখন সেখানে বছরে তিন থেকে চারটি ফলন ফলছে আর এই বৃদ্ধিই কৃষকদের লাভ দিচ্ছে। এছাড়া চুক্তি চাষের নতুন ফর্মূলা এবং মাইক্রো সেচ প্রকল্প চাষীদের লভ্যাংশ অনেক বৃদ্ধি করেছে এবং তা দ্বিগুণ হয়েছে।

''দ্য ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট ২০১১ (The Vibrant Gujarat Global Summit 2011)''-এ রাজ্যে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনে লগ্নী এসেছে ৩৭ হাজার কোটি টাকা।

গুজরাট সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে সরকার-ব্যক্তি মালিকাধীন প্রকল্পগুলিতে। লগ্নী এসেছে ৬ লক্ষ চেক ড্যাম এবং ছোটবড় বাঁধে। এর মাধ্যমে ১০ লক্ষ নলকূপ খনন হয়েছে সারা রাজ্যে গত এক দশকে। এই সেচ প্রকল্প অতিরিক্ত ৩৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে আবাদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভূমির জলস্তর বেড়েছে ১৩ মিটার।

২০১১ সাল পর্যন্ত 'Drip and Sprinkle' প্রকল্পের আওতায় ছিল মাত্র ১০ হাজার হেক্টর জমি আর এখন তা হলো ৭ লক্ষ হেক্টর জমি। এই পদ্ধতি কচ্ছ জেলায় ভাগ্য খুলে দিয়েছে। এই অঞ্চল একদা ছিল শুখা অঞ্চল। এই অঞ্চলে এখন ফলছে আমলা, খেজুর, ডুমুর ইত্যাদি ফল। কেবল কচ্ছ অঞ্চল থেকেই বছরে পশ্চিম এশিয়াতে রপ্তানি হচ্ছে ৭০ হাজার টন কেশর আম। দানা শস্যের উৎপাদন ছাড়াও গুজরাট দেশের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ফল এবং সব্জি উৎপাদনের রাজ্য। এই রাজ্য উৎপাদন করে ৭৮ লক্ষ টন ফল এবং ৭৩ লক্ষ টন সব্জি।

গুজরাট গরিমায় মুম্বাই আরও একটি চমকপ্রদ সংযোজন হলো রাজ্যকে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'Washington International Food Policy Research Institute'-র স্বীকৃতি। এমনকী পড়শি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানের অকপট স্বীকারোক্তি যে, গুজরাট থেকে তাঁর রাজ্য কৃষিতে অনেক পিছনে।

রাজ্য সরকার কৃষকদের ভাবনা-চিন্তাকে নতুন দিশা দিয়েছে। রাজ্য সরকার যথার্থই প্রমাণ করছে আলোকোজ্জ্বল গুজরাট। □

সর্বনিম্ন দরপত্র দাখিলকারীই খুনের বরাত পাবে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক দশক ধরেই ভারতবর্ষ জুড়ে 'মাফিয়া', 'গ্যাঙ ওয়ার' ইত্যাদি শব্দগুলি ক্রমশ অত্যন্ত পরিচিত ঘরোয়া শব্দাবলীর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। কোনও কিছু জোরজবরদস্তি, হুমকি, গাজোয়ারি, চোখরাঙানি বা ভয় দেখিয়ে আদায়কারীরাই সচরাচর 'মাফিয়া' নামে চিহ্নিত হয়। আদি মাফিয়ার উৎপত্তিস্থল বা পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। কথাটি গত শতাব্দীর ৩০-৪০-এর দশকে ইতালীর ভয়ঙ্কর দাঙ্গাবাজ বা ভাড়াটে খুনীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হোত। এই সূত্রে অনেকেই বিশ্বখ্যাত বেস্ট সেলার মারিও পুজোর 'গড ফাদার' উপন্যাসটি স্মরণ করতে পারেন। পরে মূল কাহিনী অবলম্বনে প্রখ্যাত অভিনেতা মারলন ব্রান্ডো অভিনীত একই নামের ছবিটি জগৎবিখ্যাত হয়। ছবির মূল উপজীব্য পারস্পরিক স্বার্থের হানাহানিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস ও ছায়াছবির কুশীলবদের নৃশংস ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডগুলির চলচ্চিত্রায়ণ। ঘটনার পেছনে থেকে বা নিজেকে আড়াল করে কী অবলীলায় ভাড়াটে বাহিনী ঈপ্সিত লক্ষ্যকে পৃথিবী থেকে নিকেশ করে দিচ্ছে— এমন সব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস ও ছবি গড়ে উঠেছিল। সমাজের প্রতিষ্ঠিত অনেক কেষ্ট-বিষ্টুদের স্বার্থসিদ্ধি করতেই এই মাফিয়ারা যে কোনও ধরনের খুন জখম, চোরাচালান ও নানান বেআইনী কাজকর্মে লিপ্ত থাকত। তারা নিজেদের ক্ষমতায় অনেক সময়ই তৈরি করে ফেলতো একটি সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা। বহু ক্ষেত্রেই রাজনীতিকরাও নিজ স্বার্থে এদের মদত যোগাতেন। এই পরম্পরা কালাপানী পেরিয়ে আমাদের দেশেও আক্ষরিক অর্থেই কালোহাত বিস্তার করে দেয়। অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই প্রথম আমদানীটি হয় ভারতবর্ষের বাণিজ্য রাজধানী মুম্বাই-এ। গত দু' দশকে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জনজীবনেও এই মাফিয়া সংস্কৃতির কদর্থক প্রভাব বিপুলভাবে পড়েছে। মুম্বাই-এর 'অন্ধকার জগত' বলে

গত দু' দশকে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জনজীবনেও এই মাফিয়া সংস্কৃতির কদর্থক প্রভাব বিপুলভাবে পড়েছে। মুম্বাই-এর 'অন্ধকার জগত' বলে একটা কথাতো আকচার শোনা যায়। দেশীয় সাহিত্য, নাটক, বিশেষ করে মুম্বাই চলচ্চিত্রে এরই রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

একটা কথাতো আকচার শোনা যায়। দেশীয় সাহিত্য, নাটক, বিশেষ করে মুম্বাই চলচ্চিত্রে এরই রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ওই যে 'আন্ডারওয়ার্ল্ড'-কে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দর্শক পেয়ে যাচ্ছে যা এমনিতে তার দৃষ্টিগোচর নয়। সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে মাফিয়া পুলিশ চক্রের ওপর নির্মিত 'কোম্পানী', 'সরকার', 'ওয়ান্স আপনে এ টাইম ইন মুম্বাই' প্রভৃতি ছবিগুলি দেশীয় ভিত্তিতে আগে বলা 'গডফাদার' ছবিটির মতোই বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়। কথাগুলি বলার কারণ হচ্ছে এই মাফিয়াচক্র চালাবার হ্যাপা অনেক। বহুক্ষেত্রেই মাফিয়া দলগুলির পারস্পরিক রেষারেষিতে অনেক সময়ই এক দলের লোক আর এক পক্ষের হাতে খুন হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে উপায়ান্তর না থাকায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ জেলবাস অবধারিত হয়ে পড়ে। আদি ইতালীয় মাফিয়াতন্ত্র অনুযায়ী মাফিয়া দলে নাম লেখানো এইসব হাতে-কলমে কাজ করা পদাতিক বাহিনীর পরিবার পরিজনের দায়িত্ব তখন মাফিয়া দলপতিকেই নিতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই পুলিশ ও আইন ব্যবস্থার মধ্যে আড়কাঠি ঢুকিয়ে বা নোংরা রাজনীতিকদের হাত ধরে তাদের ভবিষ্যৎ শাস্তি বা তার মেয়াদ মকুব করানোর মতো আনুষঙ্গিক নানান উটকো ঝামেলা পোয়াতেই হয়।

খুন খারাপি, নিকেশ, লোপাটজনিত কাজকর্ম, পরবর্তী অধ্যায়ের অবশ্যম্ভাবী বিপদগুলিকে এড়াতে সম্প্রতি এখানে মাফিয়াদের Out Sourcing প্রথা চালু হয়েছে বলে সংবাদসূত্রে প্রকাশিত হয়েছে। Out Sourcing-এর যে ব্যাপারটা প্রথমে তথ্য প্রযুক্তি থেকে বিভিন্ন কর্পোরেট হয়ে সরকারি অফিসেও আজ প্রবল প্রতাপে বিদ্যমান তা যে এবার 'মাফিয়া রাজ' ও 'গ্যাঙ ওয়ারে'র ওপরও হাত বাড়াবে সেটা হয়তো অনেকেই আঁচ করতে পারেননি। Out Source-এর বহুধাবিস্তৃত ক্ষমতা সম্বন্ধে ডঃ জয় দুবাসী (স্বস্তিকার পাতায় অতিথি কলমে) একবার কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, এটা বোধ হয় লন্ডনের চাটার্ড অ্যাকাউন্টেট মহল থেকে আউটসোর্স করা। এ থেকে বস্তুটির বিস্তারের প্রভূত সম্ভাবনার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল। যাই হোক, কস্ট কন্ট্রোল বা খরচ কমানোই যে আউটসোর্সিং-এর মূল কথা তা আর বলে দিতে হয় না।

আগে আলোচিত প্রেক্ষাপটেই বর্তমান চাঞ্চল্যকর খবরটি তুলে ধরছি। খবরে প্রকাশ কলকাতা ও আশপাশে সক্রিয় থাকা অপরাধ সিন্ডিকেটগুলি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রকে জানিয়েছে— আজকাল তারা আর কুখ্যাত তথা নামকরা অপরাধীদের খুন ও অপহরণের কাজে লাগাচ্ছে না। এর বদলে তারা কোনও পরিচিত দলের সঙ্গেই যুক্ত নয় এমন আনকোরা লোকেদের দিয়েই কাজ সারছে।

উদাহরণস্বরূপ উঠে এসেছে দিলীপ ব্যানার্জী ওরফে হাতকাটা দিলীপের নাম। দিলীপ শহরের উত্তরপ্রান্তে মূলতঃ দমদমকে কেন্দ্র করে তার রাজত্ব চালাত। তার গুণ্ডাবাহিনী বিশাল অঞ্চল দাপিয়ে বেড়ানোর জন্য পরিচিত। এই বাহিনীর মালিক বা পাণ্ডা হিসেবে দিলীপের দায়িত্ব ছিল দলের সদস্যদের নিয়মিত আয়ের মাধ্যমে পেট চালানোর ব্যবস্থা করা। নিকট অতীতেও দেখা যেত দলপতি তার কাছের লোকেদের ওপর আস্থা রাখত। সেই সুবাদে খুন জখম, অপহরণের ক্ষেত্রে যানবাহনের ব্যবস্থা, অস্ত্রের সরবরাহ থেকে পরবর্তী সময়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করত। সংবাদসূত্রের এক সি আই ডি অফিসারের দেওয়া তথ্যানুসারে অপারেশনের আগেকার এই প্রয়োজনীয় কাজ ও আগে বলা অপারেশন পরবর্তী (post operation) দায়িত্ব আজকের ডনরা এড়িয়ে যেতে চাইছে। সি আই ডি-র তদন্তকারী অফিসার উদাহরণস্বরূপ হুগলীর মৃত কুখ্যাত মাফিয়া হুব্বা শ্যামলের নাম করেন। সে ছিল পুরোনো ঘরানার গ্যাঙ স্টার, যে দলকে পরিবারের মতো মনে করত।

সি আই ডি-র প্রতিনিধি জনৈক মাফিয়াদলের সদস্যের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বলছেন, দলপতির পক্ষে এত সব দায়দায়িত্ব সামলে দল চালানো আজকাল কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি টাকা পয়সার আমদানীও নাকি কমে আসায় অর্থনৈতিক সমস্যাও বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই কারণেই অনেক গ্যাঙ লিডারই দলের বাইরে থেকে লোক লাগাচ্ছে। সি আই ডি-কে জবানবন্দী দেওয়া এই ভূতপূর্ব দলপতি আজকাল দলহীন খুনী যে একা কাজ করে (অনেকের ফ্রেডরিক করসাইয়ের বিশ্বখ্যাত 'ডেজ অফ দি জ্যাকল' মনে পড়তে পারে) ও মাফিয়া সর্দারদের মধ্যে দালালির কাজ করছে। কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডী স্কোয়াডের এক অফিসারের বয়ান অনুযায়ী আগেকার গ্যাঙ লিডারদের আদায়ীকৃত তোলা বা অপহরণের বিনিময়ে এককালীন হাতানো টাকার একটা বড় অংশই দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের কাজের গুরুত্ব ও মুন্সীয়ানা অনুযায়ী বিতরিত হোত। কিন্তু এখন কাজের ধারা পাল্টে গেছে। আজকাল দলপতির একান্ত ঘনিষ্ঠ সদস্যও অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। সংঘটিত অপরাধটি দলপতি আউটসোর্সের মাধ্যমে করিয়ে নিচ্ছে। সংবাদে উঠে এসেছে এখনকার চালু প্রথা অনুযায়ী একজন ডন কুকর্মের বরাত পাওয়ার পর মিডলম্যানকে লাগিয়ে দিচ্ছে ভাড়াটে 'ঝাড়া হাত পা' খুনীর সন্ধানে। যে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই নিজ দায়িত্বে কাজটা করবে। এর পরের অংশে ডন কাজের বিবরণটা সম্ভাব্য আবেদনকারীদের দিয়ে দিচ্ছে। এই ইচ্ছুক খুনী বা অপহরণকারী তাদের ঈপ্সিত দর জানাচ্ছে। ঠিক যেমনভাবে সরকারি বেসরকারি সংস্থায় টেন্ডার ডাকা হয়। এই প্রক্রিয়াটার পরই ডন যোগ্যতা অনুযায়ী লোয়েস্ট বিডার বা সর্বনিম্ন দরপত্র দাখিলকারীকেই মহৎ কাজটির দায়িত্ব অর্পণ করছে।

সি আই ডি-র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আগেকার ডন বা মাফিয়া ঘরানা থেকে আজকের পদ্ধতি ডনের পক্ষে অনেক সুবিধেজনক ও উদ্বেগহীন বলে মনে হচ্ছে। কেননা একবার টেন্ডার জিতে নিলে নির্ধারিত ভাড়াটে খুনীরই দায়িত্ব বর্তায় তার কাজে কত লোক লাগবে, কি ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার হবে, তা জোগাড়ের পদ্ধতিই বা কি হবে, আবার খুন খারাপির পর তাকে বা শাকরেদদের কোথায় আশ্রয় নিতে হবে তার বিলি বন্দোবস্ত করার। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সূত্র অনুযায়ী এই নতুন ব্যবস্থায় পুরনো ডনদের কাজকর্ম চালানোর খরচ আগের চেয়ে অনেক কম পড়ছে। শুধু তাই নয় যেহেতু সে স্বনামধন্য খুনে দলপতি তাই তার নাম সর্বদাই পুলিশের খাতায় অবশ্য পাঠ্য হিসেবে থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে বা তার সাঙ্গপাঙ্গোরা কেউই অকুস্থলের ত্রিসীমানায় না থাকায় কোনও প্রমাণ থাকার সম্ভাবনাও লোপাট হয়ে যাচ্ছে। ভাড়াটে 'আউট সোর্সড' হওয়া খুনী কাজ হাসিল করে চলে যাওয়ায়— সূত্রের অভাবে পুলিশও ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর খুনের তদন্তকারী অফিসারের সূত্র অনুযায়ী এই মামলায় ধৃত আসামীর সঙ্গে মৃতের কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই তদন্তের গতি ঢিমে তো হয়ই— পুলিশ খুনের কোনও উদ্দেশ্যই ধরতে পারেনি। পরবর্তী তদন্তে বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসে। ব্যারাকপুর অঞ্চলেরই এক কুখ্যাত ডন ওই খুনীকে ভাড়া করে (টেন্ডারের মাধ্যমে) কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রমাণ না থাকায় পুলিশ কিছুতেই ওই ডনের দিকে নজর ঘোরাতে পারছিল না। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তার মত অনুযায়ী এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর। কেননা পরবর্তীকালে অপরাধের ক্ষেত্রে এই ভাড়া করা প্রথা বলবৎ থাকলে পুলিশের ক্ষেত্রে চুনোপুঁটি অপরাধীদের থেকে দাগী নৃশংশ খুনীকে আলাদা করে খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। □

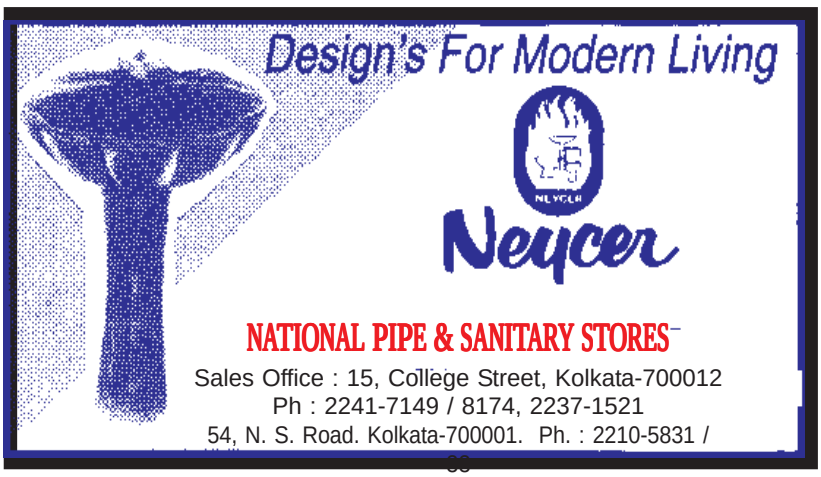

তিন মাসেই বাবা, ঠাকুর্দা ও প্রপিতামহ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কয়েক মাসের তফাতে একসঙ্গে বাবা, দাদু থেকে প্রপিতামহ হয়ে গেলেন এক ইংল্যান্ডবাসী।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার কাউন্টির ডন কাশ্মীরের বাসিন্দা ৬০ বছর বয়সী প্যাট্রিক স্লোয়ানের আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই অবসর নেওয়ার কথা। সেও ভাবছিল আর বাচ্চা-কাচ্চা মানুষ করার দিন তার রবাবরের মতোই পেছনে চলে গেছে। এমনি সময় গত মার্চ মাসে স্লোয়ানের তিনটি পূর্ণ বয়স্ক ছেলেরা তাদের একটি সর্বকনিষ্ঠ ভাইকে পেয়েছে। স্লোয়ানের ছোট্ট চতুর্থ সন্তানটির নাম হয়েছে এথান। ইতিমধ্যে জুন মাসে তার তরুণ বয়েসের এক ছেলে তাকে লিওনার্ড নামে এক নাতি উপহার দিয়েছে। ষোলকলা পূর্ণ করে এর দিন বারো পরেই নাতির হাত ধরে দাদু স্লোয়ান আবার প্র-দাদুও (প্রপিতামহ) হয়ে গেছে। শিশুটির নামকরণ হয়েছে ম্যাসন।

তবে, আকস্মিক এতটা বয়সে বাবা হবার খবর শুনে হতচকিত স্লোয়ান লোকলজ্জার ভয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেও তার বন্ধু-বান্ধবেরা ব্যাপারটায় খুশিই হয়েছে।

লন্ডনের মিরর পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে শিশুর বাবা হিসেবে নিদ্রাহীন রজনী যাপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক হ্যাপা পোয়ানোর ভাবনায় স্লোয়ান কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়লেও শেষ খবর অনুযায়ী নতুন বাবা হওয়ার খুশিতে সে এখন মশগুল। বাচ্চার যে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে রেডি। আপ্লুত স্লোয়ান জানাচ্ছে শিশু এথান তার কাছে এমন একটি দেবদূতের মতো যে তার জীবন নিত্য হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে।

সত্যিই তো, এমন সৌভাগ্য সচরাচর দেখা যায় কি?

নেত্রদান মহাদান

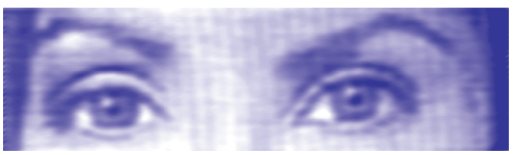

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

যোগে রোগ মুক্তি

আশীষ পাল

কীভাবে প্রাণায়াম করতে হবে

জ্ঞান মুদ্রায় বসে প্রথম শ্লোক বলা (১ বার)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।।

অর্থ : তুমিই আমাদের মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, সখা তুমিই আমাদের বিদ্যা ও ধনৈশ্বর্য, তুমিই আমাদের দেবতা, তুমিই আমাদের সবকিছু।

দ্বিতীয় শ্লোক : গায়ত্রী মন্ত্র (তিন বার)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

(দ্রষ্টা ঋষি বিশ্বমিত্র)

অর্থ : পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গরূপে অবস্থিত সেই প্রকাশ স্বরূপ অন্তর্যামী পুরুষের সর্বলোক প্রার্থনীয় জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। সেই অন্তর্যামী যেম আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রকৃষ্ট রূপে চালনা করেন।

তৃতীয় শ্লোক : ওম্ জপ (অ+উ+ম)

এক এক অংশকে তিনবার করে উচ্চারণ করা, ধ্যান সহকারে মনে রাখতে হবে

অ-কার—ব্রহ্মা স্বরূপ
উ-কার—বিষ্ণু স্বরূপ
ম-কার—মহেশ্বর স্বরূপ

১ম অ-কার ধ্যান : (১) নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া (২) নাভির উপর (অর্থাৎ ব্রহ্মা স্বরূপ) ধ্যান রেখে অ-কার উচ্চারণ করা (তিনবার)।

২য় উ-কার ধ্যান : (১) নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া (২) হৃদয় থেকে অনুভব করতে হবে (বিষ্ণু স্বরূপ) উ-কার উচ্চারণ করা (তিন বার)।

৩য় মকার ধ্যান : (১) নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া (২) মস্তিষ্ক থেকে অনুভব করতে হবে (মহেশ্বর স্বরূপ) ম-কার উচ্চারণ করা (তিন বার) ওই সময় মুখ বন্ধ থাকবে।

শ্বসন শুদ্ধি : (১) নাকের ডান ছিদ্র ডান হাতের ডান অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ করে বাঁ নাকে বাঁ ছিদ্র দিয়ে ৬ বার জোরে জোরে শ্বাস বাইরে ছাড়া।

(২) নাকের বাঁ ছিদ্রকে ডান হাতের মধ্যমা অনামিকা আঙুল দ্বারা বন্ধ করে ডান নাকের ছিদ্র দিয়ে ৬ বার জোরে জোরে শ্বাস বাইরে ছাড়া।

(৩) নাকের উভয় ছিদ্র দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস বাইরে ছাড়া ৬ বার।

তারপর প্রাণায়াম শুরু করা।

যদিও অজস্র প্রাণায়াম আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে কিন্তু সব প্রাণায়াম সবার জন্য ঠিক নয়। আবার সব প্রাণায়াম অভ্যাস করাও সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েকটি প্রাণায়াম সহজ আকারে বর্ণনা করা হলো যা সবার পক্ষে করা সম্ভব হবে। প্রতিদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাস করলে ফল পাবেন অফুরন্ত।

বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

□ □ □ □ □

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

‘হিগস-বোসন কণা’ বা ‘ঈশ্বর কণা’

ধীরেন দেবনাথ

বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ‘ঈশ্বর কণা’র আবিষ্কার এক ‘মাইলস্টোন’ হয়ে থাকবে। আর ৪ জুলাই (বুধবার), ২০১২ দিনটিও বিজ্ঞানের ইতিহাসে থাকবে ‘স্বর্ণাক্ষর’-এ লেখা। কারণ ওই দিনটিতেই নব আবিষ্কৃত মৌলিক কণাটির অস্তিত্বের কথা ঘোষিত হয়েছে। ফলে পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের হলো সূচনা।

সত্যেন বোস

হিসন

আবিষ্কৃত কণাটিকে ‘ঈশ্বর কণা’ (গডপার্টিকল) বলা হচ্ছে কেন? সত্যি বলতে, যাকে ‘ঈশ্বর কণা’ বলা হচ্ছে তার সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। ১৯৬৪ সালে স্কটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিগস অনুমান বা কল্পনা করেন এই কণাটির অস্তিত্ব। কিন্তু এরও পূর্বে ১৯৬০ সালের দিকে পদার্থের ভরসংক্রান্ত ব্যাখ্যায় অংশ নিয়েছিলেন বহু বিজ্ঞানী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আবিষ্কৃত কণাটিকে ‘ঈশ্বর কণা’ (গডপার্টিকল) বলা হচ্ছে কেন? সত্যি বলতে, যাকে ‘ঈশ্বর কণা’ বলা হচ্ছে তার সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। ১৯৬৪ সালে স্কটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিগস অনুমান বা কল্পনা করেন এই কণাটির অস্তিত্ব। কিন্তু এরও পূর্বে ১৯৬০ সালের দিকে পদার্থের ভরসংক্রান্ত ব্যাখ্যায় অংশ নিয়েছিলেন বহু বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে ফিলিপ আন্ডারসন, ইয়োচিরো নাম্বু, জেফ্রে গোল্ডস্টোন উল্লেখযোগ্য। ছিলেন আরও কয়েকজন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন অনেকে। সর্বাগ্রে ভরের রহস্য ব্যাখ্যা করেন ফ্রাঁসো এঙ্গলটি ও রবার্ট গাউট। এঁদের পরে পিটার হিগস এবং সবশেষে টমাস কিবল, জেরাল্ড গুরালনিক ও কার্ল হাগেন। শেষোক্ত ছয় বিজ্ঞানীই কেবল পদার্থের ভর ব্যাখ্যাকারীই নন, তাঁদের রয়েছে গবেষণাপত্রও। তবে একমাত্র হিগসই প্রথম বলেছিলেন কোনও এক বিশেষ কণার কথা, যা পদার্থকে জোগায় ভর। অন্য পাঁচজন কোনও কণার কথা বলেননি। কিন্তু ভর সৃষ্টির রহস্য তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। হিগসের সঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের পার্থক্য এখানেই।

অতঃপর কেটে গেছে বহু বছর। কাল্পনিক কণাটির গুরুত্ব সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হিগসের এক ছাত্র লিও লেডারম্যান তাঁর গবেষণা- পত্রের নামকরণ করেন ‘হিগস-বোসন’। কিন্তু গবেষণাপত্রটি যখন বই আকারে প্রকাশ করতে গেলেন তখন বেঁকে বসলেন প্রকাশক। তাঁর বক্তব্য, ওই নামে বই বিক্রি হবে না। তিনি চাইলেন অন্য নাম। লেডারম্যান বিরক্তি প্রকাশ করে বইয়ের নাম রাখলেন, ‘গডড্যাম পার্টিকল’ (Goddam Particle) অর্থাৎ যাচ্ছেতাই কণা। প্রকাশক বাতিল করলেন এ নামও। অবশেষে বইটির নামকরণ করা হলো— ‘দ্য গডপার্টিকল’ বা ‘ঈশ্বর কণা’। বইটির নামের সঙ্গে ‘গড’ বা ঈশ্বর নামটি যুক্ত থাকায় বিক্রি হলো রেকর্ড সংখ্যায়। আর এই নামের সুবাদে অনেকেই বিশ্বাস করছেন, বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। মূলত ‘ঈশ্বর কণা’ নামটি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লেডারম্যানেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। আসলে ‘ঈশ্বর কণা’ বোসন কণা’রই সমগোত্রীয়। তবে হিগসকল্পিত ‘হিগস-বোসন কণা’ আর ‘ঈশ্বর কণা’ হুবহু এক নয়। আবিষ্কৃত মৌলিক কণাগুলি দু’ভাগে বিভক্ত। যথা : বোসন ও ফার্মিয়ন। ‘ফোটন’, ‘গ্লুয়ন’, ‘হিগস- বোসন’ কণাগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘বোসন-কণার’র মতোই। পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র এই সব ‘বোসন’ জাতের কণা (১৯২৪ সালে বঙ্গবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কল্পিত ‘বোসন’) ‘বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব’ মেনে চলে। ‘হিগস-বোসন কণা’র ন্যায় ‘ঈশ্বর কণা’ও এই সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে। কাজেই ‘হিগস-বোসন কণা’র আবিষ্কারের কৃতিত্ব হিগসেরই পাওয়া উচিত। তবে ‘হিগস-বোসন কণা’ ও ‘ঈশ্বর কণা’র মধ্যে হুবহু মিল না থাকলেও একটি বিষয়ে কিন্তু মিল রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে— দুটি কণাই পদার্থের ভর সৃষ্টিকারী। সেদিক থেকে বিচার করলে ‘হিগস-বোসন কণা’ বা ‘ঈশ্বর কণা’ অবশ্যই ‘বোসন’। এখন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, ‘ঈশ্বর কণা’ বিভিন্ন কণাকে ভর জোগায়। কিন্তু এই ভর না

জোগালে কী ক্ষতি হোত? এর উত্তরে বলা যায়, পদার্থ বা তার কণাগুলি ভরহীন হলে কণাগুলি পেত আলোর বেগ। ছোটাছুটির ফলে কণায় কণায় মিলন হোত না। সৃষ্টি হোত না অণু-পরমাণু। অণু-পরমাণু সৃষ্টি না হলে সৃষ্টি হোত না পদার্থ, গ্রহ, নক্ষত্র, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও পৃথিবী। অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকত না।

যাই হোক, পদার্থ বিজ্ঞানীরা কিন্তু হাল ছাড়েননি। 'ঈশ্বর কণা'র সন্ধানে চালিয়ে গিয়েছেন তাঁদের গবেষণা। তবে সবই ছিল তাত্ত্বিক। দীর্ঘ কয়েক বছর পর ২০০১ সালে আমেরিকার ফার্মিল্যাবে 'টেভাট্রন' যন্ত্রে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো ওই কণার। এদিকে অন্য একদল বিজ্ঞানী 'ঈশ্বর কণা'র খোঁজে ১৯৮৫ সালে ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে জেনিভার কাছে ৫৭৮ ফুট মাটির গভীরে গড়ে তোলেন এক বিশাল ল্যাবরেটরি, যার নাম সান ল্যাবরেটরি। এখানে বিশালাকার 'লার্জহেড্রন কোলাইডার' যন্ত্রে বিশ্বের প্রায় এক হাজার বিজ্ঞানী ২০০৮ সালের রত হন গবেষণায়— যা ছিল ফার্মিল্যাবের সঙ্গে এক প্রকার প্রতিযোগিতা। 'ঈশ্বর কণা'র খোঁজে ফার্মিল্যাবের বিজ্ঞানীরা যা যা করছেন সানের বিজ্ঞানীরাও করেন সেই সেই কাজ। এখানেও বিপরীত দিকে বা মুখোমুখি আলোর বেগে ধাবমান ধনাত্মক তড়িৎ বিশিষ্ট প্রোটনকণার স্রোত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টি করে অভাবনীয় শক্তি বা এনার্জি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের পরবর্তী অবস্থাও হয় সৃষ্টি। তাছাড়া সংঘর্ষে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ শক্তি থেকে সৃষ্টি হয় কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত 'ভর-শক্তিসূত্র' ($E=mc^2$) মেনে। (এখানে E= শক্তি (Energy), m= ভর (mass) এবং C= আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে)। আইনস্টাইনের সূত্রটি হলো—ভর শক্তিতে এবং শক্তি ভরে রূপান্তরিত হতে পারে। কণাগুলি আবার জন্মের পরে এক সেকেন্ডের কয়েক কোটি ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে জন্ম দেয় পুনরায় আরও কোটি কোটি কণার। তাই বিজ্ঞানীদের হিসেব, প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষে উৎপন্ন শক্তি থেকে জন্ম নেবে 'ঈশ্বর কণা'। যারা আবার ধ্বংস হয়ে জন্ম দেবে নতুন কণার। তাই প্রশ্ন, প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষে 'ঈশ্বর কণা' সৃষ্টি হয়েছে কিনা! সেই খোঁজই চলছে এখন এল এইচ সি অ্যাটলাস ও সি এম এস (কমপ্যাক্ট মিউয়ন সলিনয়েড) যন্ত্র দুটিতে, প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষে যে প্রোটনের ধ্বংসস্তূপ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে। দুই যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত দু' দল বিজ্ঞানীই ধ্বংসস্তূপ বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, তাঁরা একটি নতুন কণার সন্ধান পেয়েছেন, যেটির ভর ১২৫টি প্রোটন ভরের সমান ($125 \times 1.6725 \times 10^{-24}$g) প্রায়। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি নিঃসন্দেহে 'বোসন' এবং অবশ্যই ভারী বোসন। এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত— এখানে ভুলের সম্ভাবনা ৩৫ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আর এই ভারী বোসনই 'হিগস-বোসন কণা'র কাছাকাছি, তাই এর উদ্ভাবন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুগান্তকারী। কারণ হিগস-কল্পিত কণা যেখানে পদার্থের ভরের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম সেখানে নতুন আবিষ্কৃত কণাটি ব্যাখ্যা করতে পারে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বহু রহস্য। তবুও 'ঈশ্বর কণা' এখনও অধরা।

অতঃপর 'ঈশ্বর কণা'র সন্ধানে চলবে আরও গবেষণা। হিগসের কল্পিত কণার সঙ্গে এর পার্থক্য কতটা তা জানার চেষ্টা চলবে। এপর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক কণা (Elementary Particle)-র সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। হয়তো নতুন কণা সন্ধান দেবে বাকিদের। বিজ্ঞানী হিগস (৮৪) নতুন কণা আবিষ্কারে আনন্দিত। থাক না তাঁর কল্পিত কণার সঙ্গে এর অমিল কিছুটা। তাতে কী? পদার্থকে ভর জোগানোর মতো কণার অস্তিত্ব যে আছে তাতেই তিনি খুশি। এখন দেখা যাক, নোবেল কাদের বা কার ভাগ্যে জোটে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু যা খুঁজে পেয়েছেন তাতেই উল্লসিত। কারণ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা বিফল হয়নি। বিজ্ঞানীদের আশা, সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন হিগস-কল্পিত কণা বা 'ঈশ্বর কণা'র সন্ধান তাঁরা পাবেনই। মৌলিক কণার বংশবৃদ্ধি করতে পেরে তাঁরা এতটাই আত্মপ্রত্যয়ী যে 'ঈশ্বর কণা'র অস্তিত্ব যে আছে তার অকাট্য প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন।

তবে আনন্দের বিষয় এই যে 'ঈশ্বর কণা' সন্ধানের বিশাল কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত শত শত বিজ্ঞানীর মধ্যে রয়েছেন প্রায় শ'খানের ভারতীয় বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে আবার চারজন বঙ্গ সন্তান— অধ্যাপক সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাত্যকি ভট্টাচার্য, সুবীর সরকার ও সুচন্দ্রা দত্ত। এঁরা সবাই কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর গবেষক। এঁদের সবাই ছিলেন সার্ন-ল্যাবরেটরিতে কর্মরত। একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এঁরা প্রত্যেকেই। যেমন, সুবীর সরকার ছিলেন সান-এর 'গ্রিড কম্পিউটিং'- এর কাজে নিযুক্ত। এটি ভবিষ্যতে ইন্টারনেটের বিকল্প হতে চলেছে। 'সিলিকন ট্র্যাকার' তৈরির কাজে প্রায় ১৫ বছর নিযুক্ত ছিলেন সুচন্দ্রা দত্ত। এর কাজ প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের পর উৎপন্ন প্রতিটি কণার পথ চিহ্নিতকরণ ও তাদের উৎস নির্ধারণ। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে যুক্ত ছিলেন গবেষক সাত্যকি ভট্টাচার্য। 'গামা-গামা চ্যানেল'-এর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন মনোজ শরণ। আর সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এঁদের 'Friend, Philosopher and Guide.' তাঁর নেতৃত্বে গড়া এই গবেষক- বিজ্ঞানীরাই 'হিগস-বোসন কণা' সৃষ্টির গবেষণায় ছিলেন রত। তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন টি আই এফ আর (টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ) ও ফার্মিল্যাবের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া দু' দশকেরও বেশি রয়েছেন সার্ন-এর বহু গবেষণার কাজে নিযুক্ত। সার্ন-এর সি এম এস ডিটেক্টরে ক্যালোরিমিটারের কাজের সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি এঁদের অনেকেরই শিক্ষক। ভারতীয় তথা বাঙালি হিসেবে গর্ব করার যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের। ১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মৌলিক কণা 'বোসন'-এর অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেন সারা বিশ্বে। তাঁর আবিস্কৃত 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব' মেনে চলা মৌলিক কণাগুলিকে বলা হয় 'বোসন', যা তাঁর পদবী অনুসারে গৃহীত হিগস-কল্পিত কণাও চরিত্রগতভাবে বোসন'-এর মতো। তাই বিগস 'বোসন' উপাধিটা যুক্ত করেছেন তাঁর নামের সঙ্গে। তাই তাঁর নাম আর একবার উঠে এলো 'ঈশ্বর কণা' অনুসন্ধানকালে। 'হিগস-বোসন কণা'র নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞানী হিগস ও বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পদবী (বোসন)। 'ঈশ্বর কণা' অনুসন্ধানে নিযুক্ত চার বাঙালি বিজ্ঞানী ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় স্বভাবতই আমরা গর্বিত। ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করায় আমরা আরও গৌরবান্বিত। জয়তু 'ঈশ্বর কণা'। □

রতলামে সর্বভারতীয় ক্রীড়া সম্মেলন

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশের রতলাম-এ অখিল ভারতীয় ক্রীড়া সংস্থা ক্রীড়াভারতীর দু'দিনের বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকে সকল প্রাদেশিক আহ্বায়ক এবং সংগঠন সম্পাদকদের উপস্থিতিতে আগামী ২২-২৩ নভেম্বর রতলামে সর্বভারতীয় ক্রীড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ক্রীড়া ভারতীর আপ্তবাক্য হলো— খেলার মাধ্যমে চরিত্র নির্মাণ এবং রাষ্ট্র নির্মাণ। ওই বৈঠকে সর্বভারতীয় সংরক্ষক লক্ষণরাও পার্ডিকর এবং সাধারণ সম্পাদক রাজ চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতীয় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমপক্ষে ৫০ জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সংযোজক মধুময় নাথ। প্রসঙ্গত, আগামী ৪-৫ আগষ্ট মানিকতলাস্থিত কল্যাণ ভবনে দু'দিনের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন প্রারম্ভিক ব্যাটস্‌ম্যান চেতন চৌহান ক্রীড়াভারতীর সর্বভারতীয় সভাপতি।

ল'ইয়ার্স ফোরামের বার্ষিক অধিবেশন

অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ অনুমোদিত ন্যাশনাল ল' ইয়ার্স ফোরামের পশ্চিমবঙ্গের ৩৩তম বার্ষিক অধিবেশন গত ১৪ জুলাই আয়োজিত হলো হাওড়ার শরৎ সদনে। উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতা সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ থেকে আইনজীবীরা এসেছিলেন অধিবেশন উপলক্ষে। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের নবনির্বাচিত সদস্য লালজী চৌবেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অধিবক্তা পরিষদের ওড়িশার সভাপতি আইনজীবী প্রভাকর সাহু এবং বিশেষ অতিথি রূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সংগঠনের ক্ষেত্রীয় সম্পাদক জয়দীপ রায়, রাজ্য সভাপতি অমিয় রায় ও রাজ্য সম্পাদক কিঞ্জল বড়াল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফোরামের সহ সভাপতি অজয় নন্দী।

কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ১৫ জুলাই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির অগ্রসেন ভবনে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় দু'শো জন দর্শকের উপস্থিতিতে সংবর্ধিত হন ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জগদীশ আগরওয়াল। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন পরিষদের শিলিগুড়ি বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ সীতারাম ডালমিয়া। এছাড়াও পরিষদের শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ত্রিদিব সাহা, সহ সভাপতি মোহনলাল আগরওয়াল, নরেশ টিবরেওয়াল ও সম্পাদক চন্দন রাউত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মোনোলগস্—একা এবং একা

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জীর চিন্তন ও প্রয়োগে ম্যাক্সমুলার ভবনে হয়ে গেল একক পাঠ এবং অভিনয়ের উৎসব, 'মোনোলগস্—একা এবং একা'। বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'একক সংলাপের এরকম উৎসব পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম। অন্যান্য নাট্যকর্মীরা যা করতে পারেননি তা করে দেখালেন সুজয় চ্যাটার্জী।'

প্রথম রজনীর অনুষ্ঠান ছিল, 'মা শীতলা' পালা।

দেবতাদের যজ্ঞ থেকে উদ্ভুত এক অতি কুৎসিত নারী ব্রহ্মার আশীর্বাদে পরিণত হলেন অতীব সুন্দরী রমণীতে। এই রমণীই হলেন ব্রহ্মার মানসকন্যা— দেবী শীতলা। স্বর্গের দেবদেবী এবং পাতালের বাসুকী তার পুজো করলেও মর্ত্যের পুজো পেলেন না মা শীতলা। তখন ব্রহ্মার আদেশে মৎস্যরাজ বিরাটের কাছে গিয়ে পুজো চাইলেন শীতলা। দেবী শঙ্করীর পূজারী বিরাট তাকে পুজো দিতে অস্বীকার করায় বসন্তদেবী শীতলার অভিশাপে সারা দেশে বসন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়ল। তখন বাধ্য হয়ে বিরাটরাজ তাঁকে লাল জবা দিয়ে পুজো করলেন। এ ভাবেই মর্ত্যে শুরু হলো মা শীতলার পুজো।

শীতলামঙ্গল অবলম্বনে এই কাহিনীই অভিনয় করে দেখালেন বিখ্যাত নারীচরিত্রাভিনেতা চপলরাণী তথা চপল ভাদুড়ী। বাহাত্তর বছর বয়সেও তার অভিনয় দক্ষতা প্রশংসার দাবী রাখে।

বুদ্ধদেব বসুর তিনটি কাহিনী—'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ' এবং 'সংক্রান্তি'র মিলিত প্রয়াস 'ক্রান্তিকাল' শিরোনামে পাঠ করলেন বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী শাঁওলি মিত্র।

এই তিনটি কাহিনীতে পর্যায়ক্রমে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজ বপন, শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা, এবং সব শেষে যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের কাহিনীতে, কুরুকুল রক্ষার্থে সত্যবতী অম্বিকাকে দ্বিতীয়বার ব্যাসদেবের সঙ্গে সহবাস করতে আদেশ দেন। ভীত অম্বিকা তার দাসী অঙ্গনাকে পাঠায় ব্যাসদেবের কাছে। অঙ্গনার গর্ভে, ব্যাসের ঔরসে জন্ম নেন বিদুর। কিন্তু রাজবধূর সন্তান না হওয়ার কারণে তিনি রাজা হওয়ার অধিকার পেলেন না। এরই ফলে ভবিষ্যতে রাজত্ব দখল নিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, যার শেষ পরিণতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনীতে, প্রথমে কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে বলেন। কারণ এর ফলে কৌরবরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে জীবনের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেন কর্তব্যের দোহাই দিয়ে।

শেষ পর্যায়ে সংক্রান্তিতে শোনা যায় দুর্যোধন ও ভীমের ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করলে, সঞ্জয়ের সেই বর্ণনা শুনে ধৃতরাষ্ট্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু গান্ধারী পুত্র শোকে বিহ্বল হয়েও বলেন, অন্যায় যুদ্ধে ন্যায় বলে কিছু হয় না। জয় হয়েছে ধর্মের।

ক্রান্তিকালকে যুদ্ধ তথা হিংসা বিরোধী নাট্যপাঠ বলা যায়। আজকের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই রকম প্রয়াস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঊর্মিখবর' শিরোনামে লক্ষ্মণপত্নী ঊর্মিলার কথা পাঠ করলেন প্রণতি ঠাকুর। ঊর্মিলা রাজা জনকের নিজ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও জানকী নামে পরিচিত হন কুড়িয়ে পাওয়া কন্যা সীতা, হরধনু ভঙ্গ করে রামের সঙ্গে বিয়ে হয় সীতারই, আর লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার। এর ফলে রাজরানী হওয়ার সাধ থেকেও বঞ্চিত হয় ঊর্মিলা। সারাজীবন সীতাকে অনুসরণ করেই জীবন কাটে তার। এমনকি লক্ষণ, রাম-সীতার সঙ্গে বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথাও জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি ঊর্মিলাকে। সীতা রামের সঙ্গ পেয়েছে। ভরত ও শত্রুঘ্নের স্ত্রীরা তাদের সঙ্গ পেয়েছে, শুধু চৌদ্দ বছর ধরে স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে একা ঊর্মিলা। সীতার কাছে সবক্ষেত্রেই যেন হেরে গেছে ঊর্মিলা। রামায়ণ অবলম্বনে সদা বঞ্চিত এক নারীর কাহিনী 'ঊর্মিখবর'।

উৎসবের শেষ অভিনয় ছিল কবি জয় গোস্বামীর কাব্য উপন্যাস অবলম্বনে, 'যারা বৃষ্টিতে ভিজে ছিল'।

এ এক কন্যার কাহিনী। বাবার পেনশনের টাকায় মা মেয়ে থাকতো কাকার সংসারে। কাকা তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় এক প্রোমোটারের। কিন্তু মেয়েটি মনে মনে ভালবাসে আর একজনকে। এক সময় জোর করেই অন্য এক পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। এরপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন আর লম্পট স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে সে সব ছেড়ে হাঁটা দেয় একমাত্র বান্ধবী রীণার কাছে। বাপের বাড়ির স্টেশনে দেখা হয় সেই পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে। তখন বৃষ্টি নেমেছিল। এবার রীণা ও মেয়েটি রিক্সায় উঠে রওনা দেয় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে। এই গল্পটিই একক অভিনয় করলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বর্মন। সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জীর বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হলো উৎসবটি। টাইমস্ পত্রিকায় এই উৎসবটিকে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 'হ্যাটস্ অফ্ টু সুজয় চ্যাটার্জী।'

শব্দরূপ-৬৩৬ পৃথা পাল

১					২	■	৩
৩	■	■	■	■	৪		
৫	৬	■	৭	৮	■	■	
■		■	■	৯		১০	
১১			১২	■	■	৯	■
	■	■	১৩		■	১৪	১৫
১৬		১৭	■	■	■	■	
	■	১৮					

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কুড়িটি হস্ত তাই রাবণের এই নাম, ৪. বাঁশের ফালি বা চটা, ৫. কন্দর্প, পতি, ৭. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথিযুক্ত, ৯. ফারসি শব্দে শিশির, মধ্যে অরণ্য, ১১. দেবতার আরতি, ১৩. হস্তী, শিবকর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ, ১৪. তৎসম জল, বারি, ১৬. শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি, ১৮. শ্রীক্ষেত্র।

উপর-নীচ : ১. ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ২. অতি পরিচিত পুষ্পবিশেষ, উলট ব্রজ, ৩. যীশু জননী, ৬. করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ৮. শরতের ফুল, ১০. বশিষ্ঠমুনির কামধেনু, ১১. চড়ক সংক্রান্তি বা তার আগের দিন শিব আরাধনার যে অনুষ্ঠান, ১২. সাপ, ১৫. লাল আভাযুক্ত, ১৭. বৃক্ষকাণ্ডাদির মধ্যাংশ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অরূপ পাল
বরাহনগর,
কলকাতা-৩৫

অ	■	■	শে	ষ	না	গ	■
রূ	■	■	খ	■	স্তি	■	■
প	রা	শ	র	■	ক	ব	ন্ধ
■	জ	■	■	■	■	লি	■
■	ক	■	■	■	■	ভু	■
চ	র	ক	■	র	ত্না	ক	র
■	■	নৌ	■	ট	■	■	য়া
■	বৈ	জ	য়	ন্তী	■	■	নী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৩৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ৭

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
6 August - 2012

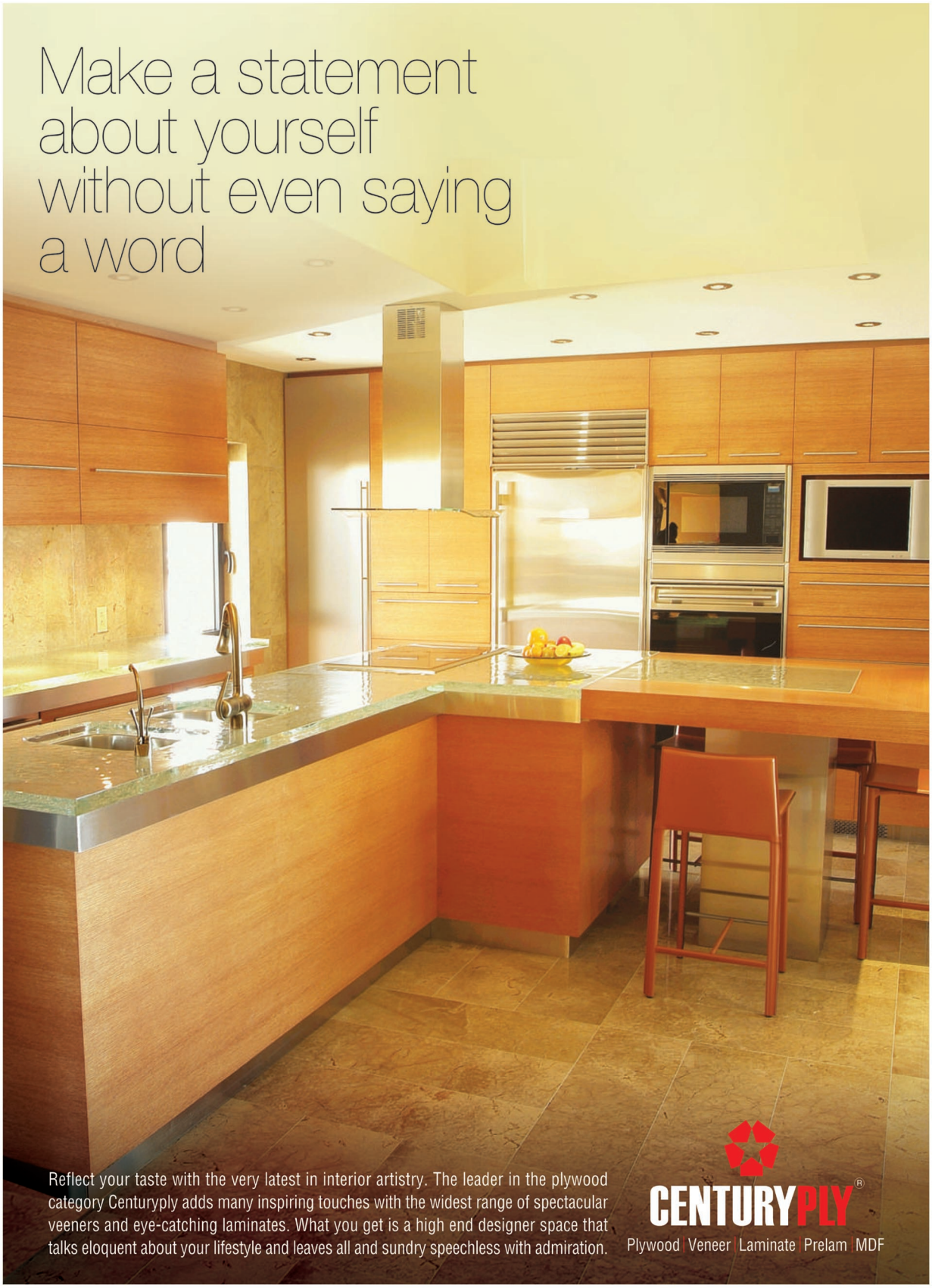

দাম : ৭.০০ টাকা